ইন্দিরা দেবী।

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক—
ারদেব মুখোপাধ্যায়
র পাবলিশিং হাউস।
াণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মু কর—
শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়,
বুধে য় প্রেস
৪৪নং ম কতলা ষ্ট্রীট্,
কাতা।

য় ক াস্ত বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছিল, বিরাজ কিছুই দেখিত না। ল ও স্থানে সুরা ও সুন্দরীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিত। পিতাকে ানই স্বাস্থ্যখারাপ—তাই পল্লীভবনে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে গিয়াছ একদিন হঠাৎ প্রকাশ পাইল সময়ে খাজনা দাখিল না হওয়ায় প্রধা "কলাবাড়ী" সূর্য্যাস্তের নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। না বেশষ চেষ্টায় বিশ বছর পূর্ব্বে এই তালুকখানি জমীদারের বি ভুয়া এপর্য্যন্ত যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ তাঁহারই অ বধা তেমন মুল্যবান সম্পত্তি অকারণে নষ্ট হইয়া গেল। বাস- প্র াব জমীদার নায়েবকে কোন অনুযোগ মাত্র না করিলেও তাঁহার রা তাহাকে কঠিন ধিক্কারে ধিকৃত করিয়া তুলিল। মনিবের উ ারত হার দুর্ব্বল চিত্তে বরং অনুতাপের ইন্ধন যোগ করিল— ল তেখানি মানসিক বিপ্লব সহিতে পারিল না—একদিন অবশেষে আ তাঁহার বার্দ্ধক্য ও ব্যাধি জর্জ্জরিত দেহ মনের বন্ধন মুক্ত করিয়া । ার পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া কিশোরী বাড়ী আসিয়াছিল। লকাতায় মেসে থাকিয়া ভবিষ্যতের উচ্চআশায় রাত জাগিয়া করিত, জানিত না যে ভাগ তা তাহার অলক্ষ্যে তাহার অন্ধকার ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন! পিতা পুত্রকে বলিয়া গেলেন, সে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় হস্তান্তরিত াবা উদ্ধার করিয়া জমীদারের কাছে অনৃণ এবং পিতার নিকট ঋণ হয়। সময়ে খাজনা না পৌঁছানর জন্য আংশিক ভাবে া! পুত্র যেন পিতৃঋণ শোধ করিয়া তাঁহার মৃত আত্মার ত করে।"

নায়েব সংবাদ লইয়াছিলেন যিনি কলাবাড়ী ক্রয় ...ছেন তি...
একজন রাজ কর্ম্মচারী, লোক খাঁটি, কিন্তু জমিদারী র...য় বুদ্ধিতে
সুদক্ষ নহেন। বিশেষ চেষ্টা করিলে রফা করিয়া ছাড়িয়া ...া পারেন
মৃত্যুর ভেরীনিনাদ কানে না বাজিলে নায়েব নষ্ট ... উদ্ধারের
চেষ্টা নিজেই করিতেন—কিন্তু সেখানকার ডাক অষ্টমের ...ার চেয়েও
অধিক জবরদস্ত। এ ডাক্ আসিয়া পৌঁছিলে আর পাছু ফি...কাইবার
"সূর্য্যাস্ত" পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার সময়ও থাকে না। এ...া বলি...
লইবার, দুইটা পরামর্শ করিবারও উপায় নাই। কাজেই ...মীদারে...
বিশৃঙ্খল জমীদারী ও অপহৃত সম্পত্তির ঋণের ভার পুত্রে...চাপাই...
দিয়া, তিনি ইহলোকের দেনা পাওনা না মিটাইয়াই ...গেলেন
ভবিষ্যতের সকল সাধের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া কিশোরী ...পরিত্যা...
জমীদারের ঋণভারগ্রস্ত জমীদারীর ভার মাথায় তু...া। ভ...
গৃহে শতছিদ্র দিয়া বর্ষার ধারা যেমন করিয়া আত্মপ্র... বিপদও
তেমনি করিয়া বিপদের অনুসরণ করিয়া থাকে। ন... অল্প
দিনের মধ্যেই দুইদিনের জ্বরে জমীদার দেবীকিশো... ...
পর্ব্বতের বাধামুক্ত বিরাজ প্রবল প্রতাপে জমীদারীর শ... স...
গ্রহণ করিল। কিশোরী এখন তাহার বেতনভুক ভৃ...তা...
প্রতি ইঙ্গিতে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে আরম্ভ করি... খ...
দিতে অসমর্থ তাহার গৃহদাহ কর, স্ত্রী কন্যাকে অপম... ...
কাছারী বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া রাখ,—এমনি সব কথি... নায়ের
উপর আসিতে লাগিল। প্রজাশাসনে অনভিজ্ঞ শিক্ষা... উচ্চ...বে
অনুপ্রাণিত কিশোরীর হৃদয় দুঃখীদের দুঃখে করুণায় ...া ...তে

লাগিল। তবু মুখ ফুটিয়া সে কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই—বরং মনের বিরুদ্ধে মুখে কড়া হুকুম দিতে হয়। সে যে ভৃত্য! হউক ভৃত্য, তবু সে নিজের বিবেকের বাহিরে চলিতে পারিবে না—দাসত্বের মূল্যে মনুষ্যত্ব বিকাইবে না। তাই যথাসম্ভব সহৃদয়তাসম্পন্ন হইয়াই সে প্রজাশাসনে মনোযোগী হইল।

শাখাপল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া তাহার এ অবাধ্যতা জমিদারের কর্ণে পৌঁছাইতে লাগিল। কারণ তাহার চেয়ে দক্ষ লোকের ত দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাই! ওপদের প্রার্থীও যে অনেক আছে। গরীবের এত তেজ মনিবের হুকুম মানে না! "বক ধার্ম্মিক," "বিড়াল তপস্বী"! প্রভৃতি উপমাযোগে তাহার নাম অভিনন্দিত হইতে লাগিল। বাপবেটায় কারসাজী করিয়া বিপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে "কলাবাড়ী নিলামে চড়াইয়াছিল," এমন কুৎসাও কিশোরকে শুনিতে হইত।—তবু পৃষ্ঠদেশে শরাঘাত সহিয়াও তাহাকে নিঃশব্দে রহিতে হইল। সম্মুখযুদ্ধে তাহার যে অধিকার নাই! কুৎসকারী স্বয়ং জমিদার বিরাজ মোহন—আর সে ভৃত্য! তবু ভৃত্যের স্বাধীনতাও তাহার নাই, কাজ ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। পিতার মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কলাবাড়ী ফিরাইয়া আনিবে। সে কেবল যুক্তকরে স্বর্গগত জনকের কাছে হৃদয়ের বল প্রার্থনা করিত। আর তার কিছুই করিবার ছিল না।

বাহিরে যতই দুঃখ থাক, অন্তঃপুরে তার মত দুর্ভাগ্যের জন্যও বিধাতা অপর্য্যাপ্ত সুখের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সে সুখ তাহার সাধ্বী সহধর্ম্মিনী কমলা! কমলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, দাসী—মন্ত্রী, শিষ্যা—সখী—একাধারে সবই সে। কিশোরীর নিরানন্দ জীবনে আনন্দের

উৎস—নিরাশাব্যথিত হৃদয়ে—আশার আলো। তাহার সকল দুঃখ সব ক্ষোভ সেই আনন্দদায়িনী সুভাষিণীর সানন্দ সান্নিধ্যে নিবারিত হইত। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া কিশোরী বর্ত্তমানকে সহিয়া থাকিত।

কলাবাড়ীর নূতন জমিদার অশাসিত প্রজা শাসনে অক্ষম হইয়া কিশোরীর অনুরোধে জমিদারী ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিরাজ তাঁহার ন্যায্য মূল্য দিতে সম্মত হইল না। সে যে মূল্যে জমিদারী বিক্রয় হইয়াছিল তাহাই দিবে, তার অধিক দিবে কেন? দিতে হয় যাহারা লাভ খাইয়াছে তাহারাই দিক্ না!

নূতন জমিদার যথাসম্ভব লাভ কম করিয়াও শুধু খরচ খরচা ধরিয়া জমিদারী ছাড়িতে সম্মত হইলেন। কিশোরী জমিদারের নাম করিয়া নিজে হইতেই তাঁহাকে তাঁহার দাবীর টাকা দিয়া জমিদারী ফেরৎ লইল। এইটুকুই তাহার ভবিষ্যতের সংস্থান ছিল; কিন্তু সেকথা এখন ভাবিবার সময় নয়—সে এখন সর্ব্বস্বের বিনিময়েও মুক্তি চায়। সামান্য হাজার কয়েক টাকা—আত্মরক্ষার কাছে ইহার মূল্য কতটুকুই বা? ক্রীতদাসত্ব হইতে ত সে বাঁচিবে! স্বাধীনতার চেয়ে আর কোন সুখই জগতে বরনীয় নহে। বিরাজের প্রমোদোদ্যানে অবাধে সুরার স্রোত বহিতে থাকে। কলকণ্ঠীর কণ্ঠকুজনে, নুপুর নিক্কনে সান্ধ্য আকাশ মুখর হইয়া উঠে; স্তব্ধ মধ্যাহ্ন সজাগ হইয়া থাকে। পিতার মৃত্যুতে ভয়ের প্রতি-বন্ধকতা না থাকায় সাহস ক্রমেই বাড়িতেছিল। গরীবের ঘরে অল্প বয়স্কা বা সুন্দরী স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করা ক্রমে দায় হইয়া পড়িল! জমীদারের দূতীরা ছলে বলে কৌশলে ভুলাইয়া আনে;—যেখানে তাহাতেও কাজ হয় না সেখানে গায়ের জোরে কাজ আদায় হয়। পুলিসে খবর দিয়াও বিশেষ

ফল পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামের পুলিস টাকার বশ; উল্টাইয়া গরীব ধনে প্রাণে মারা যায়।

সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষে পাড়ার মেয়েরা দূরান্তর পথে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল; কিশোরীর স্ত্রী কমলাও পুণ্য সঞ্চয়ের সে লোভটুকু এড়াইতে পারে নাই। পথে সে বিরাজের চোখে পড়িয়া গেল। পরস্ত্রীরূপমুগ্ধ বিরাজ কমলার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইল। কিশোরীর শারীরিক শক্তি সমর্থ বিবেচনা করিয়া সে কেবল সহসা আত্মপ্রকাশে সাহস করিল না—ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। জগতে দুষ্ট ইচ্ছা পালনের সুযোগর অভাব হয় না, বিরাজেরও হইল না।

কলাবাড়ীর নূতন জমিদার পাকা কথা কহিবার জন্য বিরাজের কাছে সংবাদ পাঠাইলে, কিশোরীকেই বিরাজ পাঠাইয়া দিল। সংশয়হীন কিশোরী সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। সেখানকার কাজ সারিয়া, লেখাপড়া মিটাইয়া, ফিরিতে তাহার দুইদিন বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়াই সে বিরাজের অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে পাইল। সে দূতী পাঠাইয়া কমলাকে প্রলোভিত করিতে চাহিয়াছিল, মূল্যবান অলঙ্কারও নাকি দূতীর হস্তে পাঠাইয়াছিল! কমলা পদাঘাতে পাপিষ্ঠের উপহার ফিরাইয়া দিয়াছে।

পিতৃঋণ-মুক্ত কিশোরীর হৃদয় তখন বাতাসের মতই লঘু হইয়া গিয়াছিল। মুক্ত আকাশের তলে, স্বাধীন বাতাসের মধ্যে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত তাহার দেহ যেন ভারমুক্ত—সে তার পরম শত্রুকেও ক্ষমা করিল। দাসত্বের বেড়ী খুলিয়া চাকরীতে ইস্তফা দিল। এইবার বাড়ী বেচিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

বাড়ী বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে নাকি জমিদারের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দশ হাজার টাকা ধার লইয়াছে! বাড়ীর পাট্টাও দুই হাজারে উহার কাছেই বন্ধক আছে! ঋণ শোধের মেয়াদও নাকি ফুরাইয়া আসিয়াছে,—তিন দিন মাত্র বাকী। ইতিমধ্যে সমস্ত দেনা মিটাইতে না পারিলে, তাহাকে আদালতে দাঁড়াইতে হইবে। বন্ধকী কোবালা চাহিয়া কিশোরী দেখিল তাহাতেও কোন গলদ নাই। সহি তাহার নিজেরই বটে!—সে সর্ব্ব-হারার হাসি হাসিয়া বাড়ী ফিরিল—কমলা তাহার মুখ দেখিয়া ভয় পাইল।

তাহার পিতৃপিতামহের জন্মমৃত্যুর স্মৃতিপূর্ণ—এ তাহার পৈত্রিক ভিটা। আজ সেখানে তাহার জন্য স্থান নাই। তবু সে কদাচারী অপব্যয়ী নয়। দান ধ্যানে রিক্ত হইয়া স্বর্গের পথও সে মুক্ত করে নাই,—তবু সে আজ পথের ভিখারী! কলাবাড়ীর উদ্ধারে তাহার নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে। কমলার গহনা, ঘরের জিনিষ পত্র এবং পৈত্রিক ভিটা বিক্রয় করিয়া কিশোরী আজ অঋণী হইয়া পথে অসহায় দাঁড়াইল। কদিন আগে সে যে ইচ্ছা করিয়াই ভিটা বেচিতে গিয়াছিল সে কথা এখন ভুলিয়া গেল। শুধু মনে রহিল সে নিঃস্ব, ফতুর, বিশ্বে তাহার ঠাঁই নাই। কমলা শুনিয়া তাহার মত অধীর হইল না। সে প্রবোধ দিল পুরুষের ভাগ্যবিপর্য্যয় এমনই কি কঠিন সমস্যা!—তুলনায় কত গ্রহ তাড়িত রাজা মহারাজার ইতিহাস দেখাইল, ভগবানে বিশ্বাস রাখিতে কহিল, ভাগ্যে থাকে আবার সব হইবে—অস্থায়ী ধনের জন্য দুঃখ কিসের? নিঃস্ব হইয়াও যে তাহারা অঋণী হইয়াছে তাহাই ঢের এমনই সব সান্ত্বনার বাণীতে স্বামীর মর্ম্মন্তুদ অন্তর জ্বালা নিবারণ

করিতে চাহিল। মনের কথা সব বুঝিলেও বাহিরে প্রবোধ না মানিয়াই স্ত্রীর হাত ধরিয়া জমিদার দেবীকিশোরের দক্ষিণহস্ত ধর্ম্মপ্রাণ নায়েব মতিলালের পুত্র শিক্ষিত উন্নত চরিত্র কিশোরী আজ পথে বাহির হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা আত্মগোপন করিয়া গ্রামের পথ ছাড়িয়া বনের পথে পথে চলিতেছিল। দীর্ঘকাল নায়েবী করিয়াও নায়েব কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থমাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ কিশোরীও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে,—"আয়ের" ভাবিয়া সঞ্চয় করিতে শিখে নাই। এই নায়েবী করিয়াই কত লোক লক্ষপতি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ পিতাপুত্র সেকথা ভাবিয়াত দেখেই নাই,—বরং দান ধ্যানে উপার্জ্জিত অর্থও নিঃশেষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বেশী থাকিলেই বা কি হইত? দশ হাজার ঋণ বিশ হাজার হইতে কতক্ষণ লাগে?

বিধি রুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন? বিধি বিতাড়িত কিশোরী গ্রামান্তরে যাইতেও পথে বাধা পাইল। চর মুখে সংবাদ পাইয়া প্রাতে অশ্বারোহণে বায়ু সেবনে বাহির হইয়া বিরাজবাহিনী সদলে বিপথে কিশোরীর চক্ষু সমক্ষে সহসা আবির্ভূত হইল। মাছ যখন বঁড়সীবিদ্ধ হয়, তখন সে জলে থাকিলেও শিকারী জানে যে সে তাহারই উদরে। কিন্তু তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিবার পর যদি চিলে ছোঁমারিয়া লইয়া যায়, তখন আর শিকারীর আপশোষের সীমা থাকে না। এত নির্য্যাতনেও যে দাম্ভিক কিশোরী তাহার তরুণী ভার্য্যাকে জমিদারের শ্রীচরণে উপঢৌকন দিয়া নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার চেষ্টা না করিয়া সস্ত্রীক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এ যেন বিরাজের ধারনাই ছিল না! আর ঐ যে সুন্দরী তরুণী নারী ও কি এই পথের ভিখারী কিশোরীর

পদসেবার দাসী! মরি মরি! এতক্ষণ বিরাজের চক্ষে বুঝি আর ভ্রূক্ষেপও পড়ে নাই! কিশোরীর উপস্থিতি, তাহার দৈহিক শক্তিমত্তা—সব ভুলিয়া সে কমলাকে আদর আমন্ত্রণে ঠাট্টা করিয়া নিজের মহত্ব প্রচার করিয়া বসিল। ইহার পর কিশোরীর আর ধৈর্য্য রহিল না। সে ভীমবলে ঘোড়ার মুখ ধরিয়া বিরাজকে টানিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল। বিরাজের হাতের চাবুক কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারাই সে তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া বসিল। সে তখন উন্মত্ত; স্থান কাল পাত্রের হিসাব রাখিবার অবস্থাও তাহার নয়। কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে বাধা দিতেও যেন কেহ সাহস করিল না। তারপর যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসায় তাহার হাতের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, তখন চারিদিক হইতে পাইক বরকন্দাজ আসিয়া জমিদার বাবুর ধূলিধুসরিত দেহ ভূশষ্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং তারপর যেমন হওয়া উচিৎ—পুলিসের সাহায্যে কিশোরীকে করচরণে বন্ধন করিয়া তাহারা থানায় পাঠাইতেও ভুল করিল না। নিরাশ্রয়া কমলার মুখ চাহিবার জন্য আজ আর জগতে কেহ বাকী রহিল না। অশেষ বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগান্তে বিচারে কিশোরীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল। নিরপরাধী ভদ্রসন্তানের স্থান হইল চোর ডাকাতের পার্শ্বে!

এক বৎসর কারাগৃহের পাষাণ প্রাচীর আর্ত্তনিশ্বাসে ভেদ করিয়া একদিন কিশোরী আবার মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। ধৈর্য্যহীন হইয়া সে যে আত্মহত্যা করে নাই—সে যে পাগল হইয়া যায় নাই—সে কেবল কমলার চিন্তায়। মুক্তি পাইয়া সে আগেই তাহার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের বাহিরে এক পতিত-পুষ্করিণীর

বিধবার আশ্রয়ে সে স্বামীর মুক্তির দিন গণিয়া গণিয়া নিজের দিন ফুরাইয়া রাখিয়াছিল। বিধবার তিনকুলে কেহই নাই—তাই জমিদারের রোষ তাহাকে আতঙ্কিত করে না। রাজদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর স্ত্রী এবং জমিদারের শিকারকেও সে নিজের গৃহে স্থান দিতে ভয় করিল না। মানুষের কাছে তাহার আর ভয় করিবার কিছুই নাই।

কিশোরীকে জেলে পাঠাইয়া পাপিষ্ঠ বিরাজ কমলাকে নিজের গৃহে লইয়া যায়, এবং সেখানে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া অভাগিনী শেষে আত্মহত্যার চেষ্টায় ললাটে ইষ্টকাঘাত করায় খুনের দায় দেখিয়া তাহাকে গ্রামের বাহিরে পথে ফেলিয়া দেয়। প্রাতঃস্নানে বাহির হইয়া বৃদ্ধা সেই শোণিতাক্ত মৃত্যুযন্ত্রণা কাতরা রমনীকে দেখিয়া গৃহে লইয়া আসে। সেবা যত্নে তাহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই যে সতী শয্যা লইয়াছিল, সে শয্যা ত্যাগ করিয়া আর উঠিল না। অসময়ে প্রসব হইয়া তাহার দুর্ব্বলদেহ একেবারে জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলিল। ছেঁড়া মাদুরের উপর তাহার বুকের কাছে একরাশি ফুটন্ত চামেলি ফুলেরমত ছোট মেয়েটি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সুখে ঘুমাইতেছিল। ঘুমন্ত মেয়ের শীর্ণ হাতখানি স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া সতী পরমানন্দে শেষ নিশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম লইয়া যন্ত্রণার কারাবাস এড়াইয়া শান্তিধামে চলিয়া গেল। মরণের পূর্ব্বে দু'টি কথা সে বলিয়াছিল—"পাপীর শাস্তি ভগবানই দেন, তুমি আর নিমিত্ত হইও না।" আরও বলিয়াছিল—"পারোত অপরাধীকে ক্ষমা করিও—শত্রুকেও যে ক্ষমা করিতে পারে, সেই যথার্থ মহৎ।"

কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া কিশোরী সকল কথাই শুনিয়া লইল। মৃতাস্ত্রীর ললাটের আচ্ছাদিত বস্ত্রাপসারিত করিয়া দেখিল—অত্যাচারের জ্বলন্ত স্মৃতিপূর্ণ ক্ষতচিহ্ন তখনও সেখানে গভীররূপে বর্ত্তমান। মৃত্যুর ছায়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দরমুখে চিরস্থায়ী মলিনতা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। এই কুসুম পেলব দেহলতা, এই ত্যাগশীল মূর্ত্তিমতী ক্ষমা, নারীদেহ শ্মশানের চিতাশয্যায় স্বহস্তে তাহাকে দাহ করিতে হইবে! তাহার অন্ধকার জীবনাকাশের তারা, তাহার সংসারের বন্ধন এমন করিয়া নির্ম্মম কুঠারাঘাতে অকালে যে উচ্ছেদ করিয়া দিল, তাহাকেই সে ক্ষমা করিবে?—কখনও নয়! মৃতার হিম শীতল করতল নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল—কমলার মৃত্যুর সে শোধ লইবে। এই যে দরিদ্রের অমূল্যরত্ন দস্যুহস্তে লুণ্ঠিত হইল, জগতে কি এর বিচার নাই? দেবতা নাই? কিশোরীর মনে হইল হয় ত নাই! নাই থাকুন—সে নিজের হাতেই তার বিচারের ভার তুলিয়া লইবে,—প্রতিহিংসার মন্ত্রজপে সিদ্ধিকে বরণ করিবে, দয়া মায়া স্নেহ ধর্ম্ম জীবনের মত সব বিসর্জ্জন দিবে,—তবে—তবে—তাহার অন্তরের অনির্ব্বাণ জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে। দেবতা কেমন করিয়া দানব হয় সে তাহা জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখাইবে।

তারপর ছয় ঋতু বক্ষে বহিয়া কত মাস বর্ষ গতায়াত করিল সে তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারিল না; সে তখন পাগল হইয়া গিয়াছিল। আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা শিশুটীকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন। পাগলের ভারও তাঁহার উপর। পাগলের কোন উৎপাত ছিল না সে আপনার গৃহকোটরে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, নিজে নিজে বিড় বিড় করিয়া বকিত, ডাকিলে উঠিয়া আসিয়া স্নানাহার করিত। এমনই

করিয়াই সাতবৎসর চলিয়া গেল,—পাগল তাহার কোন হিসাবও পাইল না।

ঘনান্ধকার রাত্রে তড়িল্লতার আকস্মিক আবির্ভাবে যেমন চারিদিক সচকিতে জাগিয়া উঠে তেম্‌নি কোন্ অনুভূত তীব্র বেদনার অনুভবনীয় স্পর্শে তাহার সুপ্ত মানসিক শক্তি সহসা একদিন জাগিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের কুম্ভকর্ণ নিদ্রান্তে জাগিয়া সে যেন শুনিতে পাইল "মরেচে"! এই একটী ছোট্ট কথা, কিন্তু তাহার বিরাট ভাবের অস্তিত্বের ভিতর দিয়া কিশোরীর হৃত চৈতন্যটাকে যেন সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত লঘুদ্রব্য খণ্ডের মত ঠেলিয়া ছুড়িয়া কূলে উঠাইয়া দিয়া গেল। চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া পাগল শুনিল—তাহাদের আশ্রয়দাত্রী—জন্মজন্মান্তরের বন্ধু দয়াবতী বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে। আর মৃতার বুকে লুটাইয়া তাহার সাত বছরের মেয়ে 'মা' মা' বলিয়া বুক-ফাটা কান্নায় পাষাণকেও গলাইয়া তুলিতেছে।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর ধরণী যেমন করিয়া প্রথম বারিধারা শুষিয়া লয়, মেয়েকে বুকে তুলিয়া কিশোরী তেমনি করিয়াই যেন দীর্ঘকালের তাপ জ্বালা সেই মুহূর্ত্ত মধ্যে জুড়াইয়া ফেলিল। অতীতের আঘাত বেদনা দুঃস্বপ্নের মত মনে জাগিতে থাকে, সে তাহাকে মনে উঠিতে দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন তাহার জন্মান্তরের লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইল। সব না হউক,—তবু সে যতটুকু জ্ঞান বিদ্যা ফিরিয়া পাইল তাহার জন্যই ভগবানের কাছে সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল। দীর্ঘ দিনের নিদ্রাভঙ্গে সে আবার নিজেকে মানুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছে।

মেয়েকে সে প্রাণপণ যত্নে জ্ঞানে বিদ্যায় বিভূষিতা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে ভাল ভাল অংশ বাছিয়া শিক্ষা দিত,

পূজার্চনা শিখাইত, নিজের দুর্ভাগ্য জীবনের অবনতিতে সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহারা হইয়াছিল, তাহারই প্রায়শ্চিত্তার্থেই যেন দ্বিগুণ উৎসাহে মেয়েটীকে উদ্যানপালিত সুরভিস্নিগ্ধ ফুলটীর মতই সুগন্ধপূর্ণ করিয়া তুলিতে মনোযোগী হইয়াছিল। অনেক দিনের পর ভগবানের দয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নিজের সব ভুল, সব ত্রুটী তাঁহারই পায়ে সঁপিয়া দিয়া নিজেকে সে আবার তাঁহার দয়ার মানুষ বলিয়া মনে করিতে চাহিল।

দানপত্র করিয়া বৃদ্ধা তাঁহার পালিতা কন্যাকে তাঁহার সামান্য সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। কিশোরী সম্পত্তিটুকু বেচিয়া কন্যাসঙ্গে জনারণ্য কলিকাতার এক নিভৃত অংশে নিজের স্থান করিয়া লইল। সেই আশ্রয় লতাটীকে অবলম্বন করিয়া আবার তাহার দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। অতীতের দুর্ভাগ্যজীবনের অংশটার স্মৃতিটুকু অনেকখানি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল বুঝি সবটুকুই মাটীচাপা পড়িয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাহাতে মাটী নয়, কেবল ভস্মেরই স্তর পড়িতেছিল, নূতন জীবনের শান্তিনীড়ে বসিয়া সে তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই। একদিন ঝড়ে উপরের ছাইগুলা উড়াইয়া ভিতরের আগুনের তেজ প্রকাশ করিয়া দিল।

শোকের ব্যথা কমাইয়া সে যখন তাহার ইষ্টমন্ত্র প্রতিশোধের কথা ভুলিয়া আসিয়াছে, তেমন সময় একদিন সংবাদপত্রের একটা সংবাদে তাহার বুকের ভিতর ঝড় বহাইয়া আবার মাথায় আগুন জ্বালাইয়া দিল। "অত্যধিক সুরাপানজনিত হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতিতে চিত্তরামপুরের জমিদার বিরাজ মোহনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সে যেন চৈতন্যহারা হইবার

মত হইয়া পড়িল। শিকার হাতছাড়া হইয়া গেলে শিকারীর মনে যেমন হতাশাপূর্ণ হিংস্রভাব জাগিয়া উঠে, কিশোরীর মনের অবস্থাও যেন তেম্‌নি শোচনীয় ভাব ধারণ করিল। মানসিক বিপ্লবের দারুণ সংঘর্ষে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তরীর মত তাহার জীর্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায় হায়, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে ত প্রতিশোধের কোন ব্যবস্থাই করে নাই! দেনা যে রহিয়াই গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌবাজারের মোড়ের মাথায় একখানি দোতালা বাড়ী। বাড়ীর নীচে প্রেস্ এবং নর্ম্মদা মাসিক পত্রিকার আফিস—উপরে পথের ধোঁয়া ও ধূলা বাঁচাইয়া সব সার্শি বন্ধ করা একখানি সজ্জিত কক্ষে হাতওয়ালা বেতের কেদারায় বসিয়া নর্ম্মদা সম্পাদক বিনয় ভূষণ একটি ছাপা প্রুফ্ দেখিতেছিল। নর্ম্মদা তখনকার দিনে আকারে কাগজে চিত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার উপর পাঠকপাঠিকাদের সহানুভূতি সম্পন্না লেখিকা প্রতিমা রায় আবার নর্ম্মদার একচেটীয়া লেখিকা। এই নবীনা লেখিকার নাম বছর খানেক পূর্ব্বেও কেহ বড় জানিত না। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে এমনি স্বনাম-ধন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নামে যে কোন লেখাই বাহির হউক না কেন, তাহাই যেন যাদুমন্ত্রে পাঠকপাঠিকাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

বিনয় একটি ছোট কবিতার প্রুফ্ দেখিতেছিল, মন কাজে যতখানি মগ্নছিল চিন্তায় তদপেক্ষা বড় কম ছিল না।

"জীবন দেবতা যবে স্মিত হাসিহেসে সুধাইলা 'আর কিছু চাই?'
নতশিরে করজোড়ে বলেছিনু আমি—'প্রয়োজন নাই'।"

আচ্ছা এই জীবন-দেবতাটি কে? কবি বোধ করি তাঁহার অন্তরাত্মাকেই লক্ষ্য করে বলেচেন?

"যা পেয়েছি তাই ঢের 'ইহাই রাখিব কোথা' পাই না ভাবিয়া,
অবিশ্বাসে মাথা নাড়ি ম্লান হাসিহেসে গেলেন চলিয়া।
দিবস না যেতে দেখি ফুরাইয়া গেছে যা ছিল আমার,
অভাব সহস্র মুখে শতছিদ্রে বাহিরায় করি হাহাকার।"

কবি তাঁর অন্তর বেদনা আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌চেন না! উচ্ছ্বসিত জলরাশির মত তা রন্ধ্রমুখে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে পড়্‌তে চাইচে! তৃপ্তির সঙ্গেই অতৃপ্তি, আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ, পূর্ণতার একদিকে অপূর্ণতা, মিলনের পাশে বিরহ,—কুঁড়িটির উন্মেষে ফোটাফুল—যেন মেঘের অন্তরালে জলের ঝর্‌না! কি চমৎকার রকম মনের ভাবটি ভাষায় বা'র হচ্ছে! কিন্তু কেন? কেন এ অতৃপ্ত বেদনা, কেন এ করুণ ক্রন্দন?

সম্পাদক প্রুফ্‌ রাখিয়া তাহার ভাবানুসন্ধানে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় 'বিনয় ঘরে আছ?' বলিয়া ডাক দিয়া তাহার বন্ধু সুকেশ ঘরে ঢুকিল।

বিনয় নিজে কবি লেখক ভাবুক আবার সম্পাদক। কবিতা তার ভাব রাজ্যে বাস্তব হইয়া উঠে—সে ধনী সন্তান অন্নচিন্তার প্রয়োজন নাই—কাব্যে ও কল্পনায় বাধা দিবার মত কোন গুরুভার তাহার স্কন্ধেও আত্মসমর্পন করে নাই—কল্পনা তাহাকে স্বাধীন রাজ্যে বিচরণে যথেষ্ট সহায়তাও করিয়া থাকে। এখন সেই উদ্দাম কল্পনা তাহাকে কোন্‌ কবিকুঞ্জে কিসের ছবি দেখাইতেছিল সে-ই জানে।

অপরাহ্নে সে যখন সেই ঘরেই নিজের চিন্তাস্রোতে মগ্ন ছিল, তেমন সময় পাশের দরজা খুলিয়া একটি বার তের বছরের মেয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছন হইতে দুইহাতে বিনয়ের চোখ টিপিয়া ধরিতেই বিনয় চমকিয়া ধ্যানভঙ্গে হাসিয়া কহিল "বেলা—না চিন্‌তে কি আর পারুচি?"

বেলা চোখ ছাড়িয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। "কখন থেকে মা ডাকচেন, বহু দুবার ডেকে ডেকে ফিরে গেল, হচ্চে কি?"

বিনয় হাসিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কহিল, "এইবার বার বার তিন বার—আচ্ছা তুই যা, আমি যাবখ'ন।"

"না এখুনি চল খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল—দেখি কিসের প্রুফ্ দেখ্‌চ?"

বেলা বিনয়ের হাতের কাগজের উপর ঝুঁকিতেই সে কাগজখানা উল্টাইয়া ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল "না-না কি পাগলামি করিস?—ও তুই বুঝতেও পারবি না, ও একটা বাজে কবিতা।"

বেলা সাভিমানে মুখ ফিরাইল "প্রতিমার লেখা বুঝি! লিখ্‌তেই না হয় পারিনে; তা'হ'লে বুঝ্‌তেও পার্ব্ব না! এম্‌নই মুখ্যু নাকি!—বয়ে গেল, আমি দেখতেও চাইনে।"

বিনয় বোন্‌টির হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কাগজখানা মেলিয়া ধরিল "দেখ্ বাপু—আর রাগে কাজ নেই—আগে থেকে সব পড়ে রাখলে, নর্ম্মদার নূতনত্ব কি থাক্‌বে বল্‌ত?"

বেলা রাগ ভুলিয়া হাসি মুখে টেবিলের উপর হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল,—"তা সত্যি, কৈ তুমি যে বলেছিলে—একদিন ওদের বাড়ী যাবে, বা গেলে না যে! আমি তাকে বলে রাখলুম্ যে তুমি একদিন আসবে, কি মনে করলেন বল দেখি? তোমার কথা তাঁর কাছে প্রায়ই বলি। দেখবার মতন লোক,-নিজে বাসন মাজেন, রান্না করেন, ঘরকন্নার সব কাজই করেন। তাঁরই বাপের অসুখ হওয়ায় দেনা টেনা হয়ে পড়েচে। ওঁর বাপ কিন্তু লোক মোটেই ভাল নয়। কি রকম কোরে আমার দিকে যে তাকিয়ে থাকেন ভয় করে, আমার তাঁকে একটুও ভাল লাগে না। বোটানিকাল গার্ডেনে ওদের যখন প্রথম দেখি প্রতিমাকে আমি কিন্তু তখুনি ভালবেসেছিলুম, তাইত তার ঠিকানা নিয়েছিলুম।"

বিনয় বাধা দিয়া কহিল "সে সব পুরণ ইতিহাস আমার জানা আছে—বরং তার চেয়ে বেশী দিনের ইতিহাসও আমি বল্‌তে পারি। তার ক'মাস আগে থেকে তাঁর লেখা আমার কাগজে বেরিয়েছে বল্‌ ত ?"

বেলা মুখভার করিয়া কহিল—"এই বার ত সরসীতেও ওর লেখা বেরুচ্ছে ; আর ত নর্ম্মদার একলার রইলো না ।"

সত্য। এ কথাটা বিনয়ও কয়দিন হইতে ভাবিতছে, ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই। নর্ম্মদার কাব্য কুঞ্জের কোকিলটিকে একেবারে নর্ম্মদারই নিজস্ব করিয়া লইবার যতগুলা উপায় স্নে মনে মনে খাড়া করিয়াছে, যুক্তি সেগুলা সবই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে। অতর্কিত-রূপে বেলার সহিত যে দিন প্রতিমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়া যায় ভুর্ভাগ্য ক্রমে সেদিন সে বেলার সঙ্গে ছিল না ; থাকিলে সকল সঙ্কোচ কাটাইবার উপায় পাইত। বেলার মুখে সে তাহার যতটুকু বিবরণ জানিয়াছে কবিতাকুঞ্জের মহিমাময়ী সাম্রাজ্ঞীরূপিনী কুমারী লেখিকার দর্শনলাভা-কাঙ্খা মনের নিভৃত কুঞ্জে শাখা পল্লবে ভরিয়া উঠিলেও দ্বিধা বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। অপরিচিতা কুমারীর কাছে কি পরিচয়ে সে আলাপ করিবার সাহস রাখিবে ? তিনি কি মনে করিবেন ? সাক্ষাৎ করিবেন কিনা তাও ত বলা যায় না ; করিলেই বা কিসের দাবিতে একমাত্র নর্ম্মদার জন্যই তাঁহার কবি যশকে সে বদ্ধ করিতে পারে ? এমন অন্যায় দাবি তিনি শুনিবেনই বা কেন ?

রঙ্গভূমে উগ্রচণ্ডারূপিণী কাদম্বিণী ওরফে কাদীর প্রবেশে বিনয়ের কল্পনা ও চিন্তা ভিন্ন পথে ফিরিল। ভাইবোন দুজনের চোখেই বিপন্নতার ছায়া ফুটিল। কাদী পুরোন ঝি, বিনয় বেলার ধাত্রী। সেই তাহাদের হাতে

করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাই সংসারের উপর তাহার দাবি অপ্রতিহত। ভালমানুষ গৃহকর্ত্রীকে চাকর দাসী হইতে ছেলেমেয়েরাও মানিত না, ভয় করিত কাদীর রসনাকে। কাদম্বিনী ঘরে ঢুকিয়া দক্ষিণগণ্ডে বামহস্তার্পণে প্রথমে কিয়ৎকাল বিস্ময়প্রদর্শনে—পরে কণ্ঠস্বরে তাহারই আভাষ জাগাইয়া কহিল "ও আমার কপালখানা! বলি তুমিও নেকাপড়ায় জুতে গ্যাছ! বিটিছেলের এত কেনেরে বাপু চাকুরীত করবেক্ নি! এরপর শাউরীমাগী দুষবে ঐ ভাল্মান্ষের বিটিকেই না, বল্বেক কেমন ধারা মা, কিছু শিকুইনি!"

বেলাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে বিনয়ের দিকে ফিরিল "বলি হেঁগা দাদাবাবু, তোমারও কি আক্কেলখানা বলত? গর্ব্বধারিণী মা একটু মায়া মমতা হয়নিক্ গা?"

বিনয় লেখায় মনোযোগ দিবার ভান করিয়া কহিল "বল্‌গে আমার মাথা ধরেচে ক্ষিদে নেই।"

কাদম্বিনী খাদ্যদ্রব্যের অপব্যয় কল্পনায় ঝঙ্কার দিয়া কহিল "আমি অত শত বল্‌তে পারবুকনি, খাবেকনিত আগ্যেথে বল্লে হোতক। ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা দিন মিন্নত করে যাই উনকুট্টিটি বানালেক অম্‌নি সিল্ মাথা ধল্লক! যা গো বেলা বলে আয়গা—আমার কি মরবার সময় আছে যে তোদের সাথে নেকরা করি!"

কাদম্বিনী সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেলে বেলা বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "চল দাদা খাবে চল, মা বক্‌বেন তাই বলা হচ্ছে মাথা ধরেচে, খেলেই ওসব সেরে যাবে।"

বিনয় হাসিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "বারে তুই যে

জ্যোতিষী ডাক্তারী সবই শিখে ফেলেছিস্ দেখচি—আচ্ছা চল্ তবে, তোর ব্যবস্থাটাই মেনে নেওয়া যাক্।—তা দেখ্ বেলা, এবার যেদিন তুই ওদের বাড়ী যাবি, বলে রাখিস, আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আসবো, আর ওস্থলে দেখাও করে আসা যাবে।"

বেলা মাথা হেলাইয়া বলিল "বেশ। কিন্তু বলে যেন আমায় মিথ্যুক না হ'তে হয় দেখ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একখানি ছোট একতালা বাড়ী। বাড়ীর বাহির অংশটা বহু কালের অসংস্কৃত, জীর্ণ মলিন নোনা ধরা। বাহিরের দেয়ালগুলা বর্ষার ধারা ধরিয়া ধরিয়া সত্যযুগের চুনের দাগটুকু এখন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। ভিতরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল! জল ঝড় রৌদ্রের হাত বাঁচাইয়া থাকিতে পারা যায়। কেবল ধূলা ও ধূমে যতখানি সম্ভব ততখানিই মলিন। একখানি ছোট ঘরে পুরাতন তক্তাপোষের উপর মাদুর বিছাইয়া দুইটি মেয়ে মুখো মুখী বসিয়া গল্প করিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া সূর্য্যের আলো প্রতিমার সুন্দর মুখে সোনার আভা মাখাইয়া দিয়াছিল। কপালের উপর খোলা চুলের কুঞ্চনের ঢেউ নামিয়া বাতাসের চূর্ণকুন্তলদাম মৃদু মৃদু দুলাইয়া সহস্রশীর্ষ নাগিণীর মত ফনা ধরিয়া বেলার মুগ্ধনেত্রে স্বপ্ন-লোকের ছবি আঁকিতে ছিল। বেলা মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল "তবে সেই কথাই রহিল, রবিবার মার ব্রত আছে সেদিন যাবেন-ত আমাদের ওখানে? বলুন যাবেন?" প্রতিমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমিত আপনাকে বলেচি, বাবাকে না জিজ্ঞাসা করে কিছুই বল্‌তে পারব না। বাবা এখনি আস্‌বেন বোধ হয়।" বেলা একবার অনাগ্রহ ভাবে ঘরের সামান্য জিনিষ পত্রের দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল "কই আপনার কবিতার খাতাখানা দেখালেন না ত?—দাদা আপনার লেখার খুব সুখ্যাতি করেন। বলেন—আজ কালকার বড় বড় কবিদের চেয়ে আপনার লেখা কোন অংশেই নীচে নয়। শুধুই কতকগুলি শব্দের ঝঙ্কারেইত আর কবিতা হয় না, কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ভাবে।

আপনার লেখায় তার জন্য মাথাত কুটতে হয়ই না বরং মিল সেধে মিল; ক'রে দেয়।"

প্রতিমা সলজ্জে বাধা দিল, "না না আমার লেখা কিছু ভাল নয়। অতখানি বাড়িয়ে আমায় অপরাধী করবেন না। এ আবার লেখা—আমার ত ছাপ্‌তে দিতেই লজ্জা করে—আপনারা হাসেন বোধ হয় খুব—প'ড়ে?"

বেলা গম্ভীর মুখে বিজ্ঞতা ফুটাইয়া কহিল "না হাস্‌ব কেন, সেত দ্বিজেন রায়ের হাসির গান পড়ে হাসি—আপনার কবিতায় হাসির কথা থাকে না ত বরং দুঃখের ভাবই থাকে—কান্নাই পায়—সব জায়গায় অর্থ বোধও আমার ভাল হয় না। দাদা বলেন—কবিতার ভাব যত অব্যক্ত থাক্‌বে ততই ভাবের গভীরতা বোঝা যাবে। আমায় বলেন ও সব বুঝ্‌তে আমার এখনও ঢের দেরী।"

প্রতিমা লজ্জিত মুখে কহিল—"কি যে বলেন—সত্যইত অর্থ কিছু থাকে না তা বুঝ্‌বেন কি? আমি নিজেই বুঝি না?"

বেলা উচ্চহাস্যে ঘরখানাকে মুখর করিয়া দিয়া কহিল "বাঃ! তবে লেখেন কি করে?"

"এমনি জুড়ে তাড়ে কথা গেঁথে যাই—ঐ যা বল্‌ছিলেন শুধু শব্দের ঝঙ্কার, ভাবের সাড়া থাকে না!"

বেলা একথা স্বীকার করিল না, তবু গভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর মনের গোপন ইচ্ছাটাকে লজ্জার বাধা কাটাইয়া প্রকাশ করিয়া দিল। "আচ্ছা কবিতা লিখ্‌তে শেখান যায় না?—দিন্ না আমায় শিখিয়ে,—আমার ভারী ইচ্ছা করে আপ্‌নার

মতন লিখ্‌তে শিখি—আজকাল অনেক কাগজেই আপনার লেখার সুখ্যাতি বেরুচ্চে আমার এমন আহ্লাদ হয় পড়ে। দাদা বলেন—আপ্‌নার কবিতা গুলি প্রথম শ্রেণীর। আমাদের দেশ কবির আদর কর্‌তে শিখ্‌লে না—বিলাত হলে এ সব কবিতার নাম হতো কত ?”

অত্যন্ত লজ্জিত ও অসহিষ্ণু ভাবটা সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রতিমা উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিল। সেই অদৃশ্য স্তাবকের এই অযাচিত প্রশংসার ধারা যেন গোলাপের পিচকারীর অজস্রধার জলের মত তাহার নাকে মুখে ঢুকিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। লেখকমাত্রেরই নিজের ছেলেটির মত নিজের লেখাটির উপর অনেকখানি পক্ষপাতমূলক স্নেহ থাকে। যেমন স্নেহাতুর মাতৃচক্ষে অসিতবর্ণ সন্তানকে কসিত কাঞ্চনের মত মূল্যবান ঠেকে, তেমনি যেমন লেখাই হউক লেখকেরও নিজের চোখে তাহার দাম বড় কম নয়। কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহাঞ্জন চক্ষে দিয়াও মাতৃচক্ষু যেমন কালোয় সাদা দেখেন না শুধু কালটিকে ভাল দেখেন; লেখকও নিজের লেখাটিকে তেমনি স্নেহনীড়ে যত্নে রাখিলেও তাহার দোষ গুণ বিচারে অন্ধ হইয়া যান না। সৃজনের আনন্দটুকু উপভোগেই তাঁহার তৃপ্তি—সৃষ্টের উৎকর্ষত লইয় তাঁহার মনে কোন বিদ্রোহ থাকে না। অজ্ঞাত স্তাবকের স্তবেরা বাহুল্যতা তাই যেন প্রতিমার মনেও বাড়াবাড়ি বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। মুখ না ফিরাইয়াই সে কহিল “তিনি খুব বাড়িয়েই বলেন। আমার লেখার যে রকম দাম দেন তাতে আমার লজ্জা করে—বাবা বলেন তিনি দয়ালু তাই দয়া করে দেন—বল্‌বেন তাঁকে—প্রতিযোগীতায় যার যা উচিৎ প্রাপ্য তাই দেওয়াই ভাল, বেশী দিয়ে—” কথাটা শেষ না করিয়াই সে জানালার

কাছ হইতে সরিয়া আসিল "ঐ যে আপনার দাদাই বোধ হয় আশ্চেন।"

বাহিরে ভদ্রলোকদের বসিতে দিবার কোন স্থান নাই, বিনয়ের বিপন্ন অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রতিমা তাহাকে বেলার দ্বারা ঘরে আসিবার অনুরোধ জানাইল।

বিনয় ঘরে আসিলে প্রতিমা ঈষৎ নত মস্তকে নমস্কার জানাইয়া এক-মাত্র জীর্ণ কেদারাখানি তাঁহাকে বসিবার জন্য আগাইয়া দিল। বিস্ময়ের আধিক্যে বিনয় তাঁহাকে শিষ্টাচার সঙ্গত প্রতিনমস্কার জানাইতে ভুলিয়া গিয়া নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিল। কল্পনা তবে তাহাকে প্রতারণা করে নাই। কুমারী রায় শুধু লেখিকা নন লেখকদের আদর্শও বটেন! কি চমৎকার সৌজন্য! সুন্দর মুখখানি কি করুণ নম্রতায় মাখা! ক্ষীণ তনুলতাটি বেষ্ঠন করিয়া মোটা সাড়ীর অঞ্চল প্রান্তটী পর্য্যন্ত কি সুন্দর ভঙ্গীতে পদপ্রান্তে নামিয়াছে! পাতলা ঠোঁটের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের মত হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। তাহার উপমা বুঝি কাব্যের কোন উপমেয় বস্তুতেই আবদ্ধ নাই! সুগোল হাত দুখানিতে দুইগাছি করিয়া সাদা শাঁখের চুড়ী কি চমৎকারই না মানাইয়াছে! এ হাতে সোনার বালা ভূষাও ভূষ্যের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ জাগায়—তাই বুঝি স্বর্ণ এখানে স্থান পায় নাই! হাঁ কবির যোগ্য মূর্ত্তি বটে! কাব্য এখানে প্রাণ পাইয়াছে। বিনয়কে বিস্ময় মুগ্ধ ও প্রতিমাকে লজ্জিত দেখিয়া বেলা প্রতিমার আর একটু কাছে সরিয়া বিনয়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল "দাদা উনি আমায় কবিতা লিখ্‌তে শেখাবেন—কেমন শোখাবেন ত?"

প্রতিমা কথা কহিতে পাইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া মৃদু হাসিল "বেশত বেশ ত শিখ্‌বেন !" তাহাদের কণ্ঠস্বরে আশ্বস্থ হইয়া অপ্রতিভ ভাব্‌টা গোপন করিবার জন্য বিনয় তাড়াতাড়ি কহিল "তা-তা-ও কি শিখ্‌তে পার্‌বে ? তবে আপনার সাহায্য পেলে হয়ত ও-ও-শিখ্‌তে পারে।"

প্রতিমা হাসিমুখে বিনয়ের প্রতি সরলদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল ! "কি যে বলেন। আমারত ভারী ক্ষমতা !"

তারপরে বিষয়ান্তরের আলোচনায় কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় কহিল "কৈ এ মাসের নর্ম্মদা ত এখনও বার হোল না ?"

বিনয় মহা উৎসাহে নর্ম্মদার আগতকল্য শুভাগমন সংবাদ জানাইল এবং এই প্রসঙ্গে তাহাদের মধ্যকার সঙ্কোচের ব্যবধানটা সারিয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বেশ জমিয়া উঠিল।

রোদ পড়িয়া বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। গলির ভিতর সন্ধ্যার অনেক আগেই সন্ধ্যা হয়, তাহাতে একতলা বাড়ী ; সূর্য্যালোক দিবসের তৃতীয়াংশ কালই এখানে অদৃশ্য, প্রতিমা উঠিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেই পকেট বোঝাই কাগজপত্র ও দুইহাতে দড়ী ও রুমালে বাঁধা বাজারের জিনিষপত্র ঝুলাইয়া একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধলোক ঘরে ঢুকিলেন।

প্রতিমা ব্যস্তভাবে তাঁহার হাতের ভার নামাইয়া লইয়া স্মিতমুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল "বাবা, উনি নর্ম্মদা সম্পাদক বিনয়বাবু—বেলার দাদা।"

বিনয় ও বেলা আসন ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

গভীর তাচ্ছিল্যভাবে অতিথিদের প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন "আজ সকাল সকাল আমার খাবার চাই—জিনিষগুলা দেখে নাও সে !"

বলিয়া কোনদিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়াই তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রতিমা একটুখানি কুণ্ঠিতভাবে পিতার গৃহাগত আগন্তুকদের প্রতি অসৌজন্যের ত্রুটি ক্ষালনার্থই যেন কৈফিয়ৎ স্বরূপে কহিল "বাবার কাজ থাক্‌লে আর কোন দিকে মন দিতে পারেন না।"

বিনয় প্রতিমার কুণ্ঠা বুঝিয়া নিজের অপমান ভুলিয়া ব্যস্তভাবে কহিল "আজকাল সরসীতে ওঁর লেখাও মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই—স্বদেশী শিল্পের উন্নতির উপায় শীর্ষক প্রবন্ধটী না ওঁরই লেখা?"

প্রতিমা ঈষৎ গর্ব্বিত গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করিল যে তাহার অনুমান সত্য।

বিনয় যেন অন্ধকার পথে আলো পাইল। আশান্বিভাবে কহিল "তা হলেত খুব ভালই হোল, আমার বোধ হয় নর্ম্মদার জন্যও ওঁর কাছে আমি সাহায্য ও পরামর্শ চাইলেও তা থেকে বঞ্চিত হব না?"

প্রতিমা খুসী হইল। সে ভীত হইয়াছিল উঁহারা হয়ত তাহার স্নেহময় উদারচিত্ত পিতাকে ভুল বুঝিয়া যাইবেন; তাই তাড়াতাড়ি কহিল "বেশ্‌ত আস্‌বেন মধ্যে মধ্যে, বাবা সাহিত্যালোচনা পেলেই ভাল থাকেন।"

গৃহান্তর হইতে কিশোরীবাবু ডাকিয়া ত্বরা দিলেন. "মনে থাকে যেন প্রতি, ছটায় আমি বেরুব।"

প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিনয়ও উঠিল। প্রীতিপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "আজ তবে আম্‌রাও যাই, বেলা আয়!"

বেলা কাছে আসিয়া প্রতিমাকে তাহার অনুরোধ স্মরণ করাইয়া

দিয়া সে যে রবিবার নিশ্চয়ই তাহাকে তাদের বাড়ী যাইবার জন্য লইতে আসিবে এবং না লইয়া সেদিন কিছুতেই ফিরিবে না তাহার পিতার কাছে এ কথা জানাইবার অনুরোধ করিয়া তাহার সম্মতি লইয়া তবে ছাড়িল।

নমস্কার প্রতি নমস্কারের আদান প্রদান সারিয়া বেলা ও বিনয় বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়ে গাড়ীর শব্দে তাহাদের চলিয়া যাওয়ার সংবাদ প্রকাশ করিল। প্রতিমা জানালারধারে চুপ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। মনটা তাহার সেই অন্ধকার স্তব্ধ সন্ধ্যার মতই যেন অন্ধকারের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল—কেমন একটা অজ্ঞাত ব্যথা যেন মনের মধ্যে ভার চাপাইয়া দিতে চাহিতেছিল—পিতাকি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? কিছুই যেন বোঝা গেল না—তবুও মন যেন বলিতেছিল অপরিচিতের সহিত পরিচয় না হওয়াই বুঝি ভাল ছিল!

বেলার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কিশোরীবাবু প্রতিমাকেও একদিন তাহাদের বাড়ী যাইতে দিয়াছিলেন। প্রতিমা সেখানে গিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। কত বড় বাড়ী কত লোকজন—ধন ঐশ্বর্য্যের শতসহস্র চিহ্ন চারিদিকে ছড়ান—তবু তাঁহারা এই গরীবের ভাঙ্গা কুটীরে কেন যে ইচ্ছা করিয়া আসেন—এতটুকু যত্ন আদর না পাইয়াও বিরক্ত হন্ না,-সে যেন তাহা ভাবিয়া পায় না। সেখানে গিয়া সে বিনয়ের মাকে দেখিয়া যেন বেশী খুসী হইয়াছিল। শাস্ত্রে যে সব ঋষিপত্নীদের কথা সে পাঠ করিয়াছে, তিনি যেন তেমনি ধরনের মানুষ! ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যেও নির্লিপ্ত সন্ন্যাসিনী—কর্ত্তিত কেশ—গৌরবর্ণ—কৃশাঙ্গী বিধবা।

একখানা মাত্র মোটা মট্‌কার কাপড় ও একবেলা হবিষ্যান্ন ভোগের বস্তু। তবু তাঁহার দেহের লাবণ্য কি জ্যোতির্ম্ময়! সর্ব্বদাই মুখে যেন শান্ত হাসিটুকু মাখানই থাকে, সকলকেই হাসিমুখে মিষ্টকথায় তৃপ্ত করে। প্রতিমাকে এত আদর করিয়াছিলেন যে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইত মধ্যে মধ্যে সে তাঁহার কাছে যায়, তাহার মাতৃহীন হৃদয় বুঝি মা বলিয়া ডাকিবার জন্য অন্তরের মধ্যেও একটা ক্ষুব্ধ বেদনা অনুভব করিতে থাকে! কিন্তু বেলার অনুরোধেও সে যাইবার কথা পিতাকে আর বলিতে সাহস করে না। বুদ্ধিমতী বালিকা বুঝিয়াছিল এই আসা যাওয়ার ঘনিষ্ঠতা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। চিরদিন লোকালয়ের সহিত সংশ্রব এড়াইয়া চলিয়া তাহার স্বভাবটাও অনেকটা যেন নির্জ্জনতা প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। লোকসঙ্গ সেও ভালবাসিত না—কিন্তু ইহাদের কথা যেন স্বতন্ত্র—ইহাদের তাহার খুবই ভাল লাগিত—একটুও যেন পর বলিয়া মনে হইত না। তবু সে ভাললাগাকেও সাহস করিয়া প্রশ্রয় দিতে চাহিত না। মনে হইত পিতা যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মনোভাব যেন আজকাল তাহার দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিতেছিল। সে যেন আর তেমন করিয়া তাঁহার অন্তরের সবটুকুকে নাগাল পায় না। মন যেন তাঁহার সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল, আহারে রুচী থাকে না। কতদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখিয়াছে তিনি একা খোলা জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অথবা বাহিরে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। সে বিছানা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কখনও চাহিয়া দেখিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া

পুনরায় ঘুমাইতে বলেন, কখনও নীরবে তাহাকে কাছে টানিয়া চুপ করিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "কিছু না।" কখনও অতর্কিতভাবে বলেন "লেখা ছেড়ে দে বুড়ী—আর এ খেলায় কাজ নেই।" প্রতিমার মনে হয় যেন বিনয়ের সম্বন্ধেই তাঁহার কোন চিন্তা। সে অপ্রতিভভাবে মনকে বুঝায় কেন তা হইবে। কিশোরী নিজেই এখন প্রবন্ধ লেখেন, অনেক সংবাদপত্র মূল্য দিয়াই তাহা গ্রহণ করে। হয়ত সেইজন্য আর তাহার লেখার আবশ্যক নাই। নাই থাক তবু লেখায় সে যে আনন্দ পাইত তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ভাবিয়া তাহার চোখে যেন জল ভরিয়া আসে। হয়ত বিনয়বাবুও দুঃখিত হইবেন, আসিবেনও না। বিনয়বাবুর দুঃখিত হওয়া বা না আসায় তাহার যে কি ক্ষতি হইবে সে তাহার আকারটাকে ধরিতে পারে না, মন ব্যথায় ভরিয়া উঠে। তাহার রচনার কেন্দ্র যে কখন বিনয়বাবুর তুষ্টি অতুষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল—অনভিজ্ঞা সে তাহার কোন সংবাদই পায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মের অচির আগমনে তখন নগরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে "কুলপি বরফ্" "ঠাণ্ডা বরফ্" "বেলফুলের মালা" ঘন ঘন হাঁকিয়া চলিয়াছে। বড়-লোকের ঘরে তাড়িতের পাখা ঘর ঘর ঘুরিতেছে, গরীবের হাতে তালবৃন্ত।

বিনয়ের কিন্তু এ সকল জাগতিক সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য ছিলনা। তাহার বিপর্য্যস্ত চিত্তের মধ্যে এ সব তুচ্ছ সুখদুঃখের অনুভূতি আসিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন হইতে লেখিকা প্রতিমা রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহার মন এখন এমন একটা সঙ্কট কঠিন বত্মে আসিয়া পৌছাইয়াছে যেখান হইতে পন্থা স্থির করা এখন তাহার পক্ষে সমস্যা সঙ্কুল বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। সেই দিন সকালবেলা প্রতিমার একখানা পত্র সে পাইয়াছে। প্রতিমা লিখিয়াছে—তাহার কবিতা সমষ্টির সংগ্রহে "কবিকুঞ্জ" বই ছাপাইবার জন্য অনেকগুলি ছাপাখানার সত্বাধিকারী প্রকাশক হইবার আগ্রহ জানাইয়াছেন। সাহিত্যে তাহার যেটুকু যশ সেটুকুর জন্য সে নর্ম্মদার কাছেই ঋণী—তাই কবি তাঁহার শোভন শীলতার ভিতর দিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার নির্জ্জীব নর্ম্মদার উদ্দেশ্যে ছোট দুই লাইন কবিতায় আবদ্ধ কিন্তু তাহার পূর্ণ আনন্দের সঞ্চিত সুধারসটুকু সজীব সম্পাদকের বোধ হয় "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া ছিল—" তাই তাহার "আকুল করিয়াছিল প্রাণ"। চিঠি পড়িয়া বিনয় মনে মনে হাসিয়াছিল—কে বলে নর্ম্মদা তাঁহাকে লোক চক্ষে প্রকাশ করিয়াছে? আগুনকে ছাই ঢাকা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যায়? একটা দমকা বাতাসের অপেক্ষা মাত্র! স্বর্গের পারিজাত

শত যোজন দূরে থেকেও যে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। নরত্ব মন্বিষ্যতি মৃগয়তে হিতৎ—।" কস্তুরিমৃগ জানে না যে কার সুগন্ধে সে মাতোয়ারা! অনভিজ্ঞ সংসার জ্ঞানহীনা প্রতিমা নিজের মূল্য বোঝেন না, তাই মনে করেন নর্ম্মদা তাঁহাকে প্রকাশ করেছে। সারল্যের সুবর্ণ-প্রতিমা সংসারের মলিনতার অসীম উর্দ্ধে অধিষ্ঠিতা—কি আশ্চর্য্য সরলতা—বালিকার মত সরল চিত্ত—তবু লিখিবার কি অদ্ভুত শক্তি! কতটুকু অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর কত বড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে দেখিলে যেন অবাক হইয়া যাইতে হয়। এই থেকেই জন্মান্তর মানিতে ইচ্ছা করে। পূর্ব্বজন্মান্তরার্জ্জিত বিদ্যার সংস্কার মনের ভিতর ফল্গু স্রোতের মত বহিতে না থাকিলে এমন সব লেখা কি কখনও বালিকার হাতে বাহির হইতে পারে? আজকাল সকল সহযোগী সহযোগিণী একবাক্যে কুমারী রায়ের কবিতার সুখ্যাতি করিতেছেন। "ভাগি রথী" লিখিয়াছেন—" 'ভারত মুকুট' খণ্ডকাব্য। সত্যই ভারত মুকুট, বিষয় ভাব ভাষা সমস্তই উচ্চশ্রেণীর। মহিলা লেখিকার এমন লেখা আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই। লেখায় নূতনত্ব বিশেষত্ব আছে—চিরকালের 'থোড় বড়ি, আর বড়ি থোড়ের' চর্ব্বিত চর্ব্বণ নয়।" এমন প্রশংসা পাওয়া একি কম কৃতিত্বের কথা! তবু প্রবীন সম্পাদক জানেন না কত নবীন হাতের লেখা সে, জানিলে হয়ত শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন। বিনয় বুঝিয়াছিল প্রতিমার পিতা তাহার প্রতি প্রসন্ন নহেন। অথচ সে অপ্রসন্নতার মূল কোথায় তাহাও সে আবিষ্কার করিতে পারে না। মেয়ের সহিত আলাপ করিতে দিতে যেন অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। অথচ সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলেনও না। মুখে যেন শ্রাবনের মেঘ,

বনাইয়াই থাকে। কেবল একটা দমকা বাতাসের অপেক্ষা। বজ্র-বিদ্যুৎ অথবা শীতল বারি কি যে সে বর্ষণ করিবে তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ই বলিতে পারেন। তাঁহার কাছে প্রবন্ধ প্রার্থনার ছুতায় কতদিন সে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, হয় শরীর ভাল নাই, নয় অনুপস্থিত; এমনি একটা না একটা প্রতিকূল ঘটনা তাহার বিঘ্নরূপে বর্ত্তমান থাকেই। সেদিন কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া মেয়ের সহিত হাসি-খুসি আলোচনা চলিতেছিল, সে যাইতেই কাজের ছুতায় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ইচ্ছা করিয়া যেখানে হাঁ বা না বলিলে চলে সেখানে দ্বিতীয় অক্ষর পর্য্যন্ত অপব্যয় করিতে চাহেন না। মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া গেলেও যেন দেখিতে পান নাই এমনি ভাবে সরিয়া যান। বিনয় বুঝিতে পারে না, কেন? তাই বুঝিবার জন্য মনটা তাহার আকুলি বিকুলি করিতে থাকে। কিশোরী বাবু বিনয়কে যে চক্ষেই দেখিয়া থাকুন বিনয় যে তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিয়া পারে না! তিনি যে প্রতিমার পিতা! তিনি যেমনি হউন ঐ একমাত্র সুপারিসেই তাঁহার সকল অপরাধের স্খালন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইত মানুষের মত মানুষ যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সে এমনি! দারিদ্র্য তাঁহাকে হীন করে নাই বরং আরও যেন উচ্চে তুলিয়াছে। চলনে বলনে ধরণে এমনি একটা নির্ভীক তেজস্বীতা গভীর বৈরাগ্য ফুটাইয়া রাখে, যাহাতে দেখিলেই মনে ভয়ের সহিত সম্ভ্রমের ভাব জাগায়। সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে যাইবারও যেন সাহসে কুলায় না। মুখ দেখিলে মনে হয় অনেক ঝড় ঝঞ্ঝাও হয়ত সহিয়াছেন—অকাল বার্দ্ধক্যে দেহ যেন তাঁহার কর্ত্তিত মূল বৃক্ষের মত হেলিয়া পড়িয়াছে। মাথার

চুলে রূপায় তার তাহারই ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে—কে জানে কত সহিয়াছেন? মানুষের বাহির দেখিয়া ভিতরের আলোচনা করা যদি সম্ভব হইত তবে হয়ত ঐ রুক্ষ স্বভাব তীব্র দৃষ্টি সংসারের অনেক বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে পারিত। বিনয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে মেয়ের লেখাপড়ায় যত্ন লওয়াই যেন তাঁহার জীবনের এক মাত্র কর্ত্তব্য! ঐ মেয়ে তাঁহার প্রাণ! ঐ একটি মাত্র প্রাণীর উপরেই তাঁহার সংসারের সব সুখ সব আশা ন্যস্ত রহিয়াছে। মেয়ের লেখাপড়ায় সাহিত্য সাধনায় তাঁহার কোন আপত্য নাই—তবু যেন মনে হয় নর্ম্মদায় প্রতিমার লেখা দেওয়া তাঁহার আর ইচ্ছা নয়। ক্ষুন্ন চিত্ত অভিমানে ভরাইয়া সে মনে করে এ তাঁহার ভারি অন্যায়—অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা! সাহিত্যে এমন পক্ষপাতিতা তাঁহার মত মহৎ জনের অনুচিত। হইতে পারে এখন অনেকেই প্রতিমার লেখার জন্য ব্যগ্র—কিন্তু প্রথম দাবী যে নর্ম্মদার সে কথাত অস্বীকার করিতে পারিবেন না? নর্ম্মদা যে কি অপরাধে কিশোরীবাবুর রোষ দৃষ্টে পতিত হইল তাহাও সে খুঁজিয়া পায় না। অপরাধ বলিয়া দিলে তাহার সংশোধন চলে—অজ্ঞাত অপরাধের বোঝা কেবল মনের অন্ধকার ভার বাড়াইয়া নিজের ভার সমান রাখে। আজ সানুনয় পত্রে সে কিশোরীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ আশা জানাইয়া পত্রবাহক তেওয়ারি মারফৎ তাঁহার সম্মতি উত্তর পাইয়াছে। পাঁচটার সময় সাক্ষাতের কাল নির্দ্দেশ হইয়াছিল। ঘড়িটাও আজ যেন তাহার সহিত শত্রুতা সাধিতে তাহার সচল হস্ত দুইখানাকে অচলভাবে চালিত করিতেছিল। দৃষ্টির সম্মোহিনী শক্তিও সঘন কটাক্ষে তাহাদের গতি বর্দ্ধিত করাইতে পারিতেছিল না। মনকে সে যুক্তি দিয়া

বুঝাইতে চাহিতেছিল—'ওরে মন বিহঙ্গ! কোথা উড়ে যেতে চাইছিস্ সেখানে যে "সতর্ক প্রহরী" মনে হইল তাহার মুখ হয়ত মনের কথা তাঁহার কাছেতেই প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। 'হ'লইবা—তাহাতেই বা সে ভীত হইবে কেন? সৌন্দর্য্য দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এমন অন্ধ কেহ আছে কি?' চন্দ্র স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে জগতে শান্তি দেন, সূর্য্যালোকে জগৎ জীবন পায়; তাই বলিয়া চন্দ্র-সূর্য্যকে গৃহাবদ্ধ করিতে চাহিবে এমন আহাম্মক কে! পাংশুপত্য ফলে উর্দ্ধবাহু বামনের যে আশা সে আশা নয়—সে মরু মরীচিকা ভ্রান্তের দুরাশা! তবু কি মোহিনী শক্তি ঐ আশার! কি মধুর শব্দের যোজনা করে ঐ দুইটী অক্ষরে। আশা! মানব মনোদুর্গজয়ের অসীম ক্ষমতাধারিনী শক্তিময়ী আশা তোমার অনন্ত শক্তির চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। বিনয় ভাবিতেছিল পূজা করিয়া সুখ—না পাইয়া সুখ? পূজা পাওয়ায় সুখ থাকিতে পারে—কিন্তু পূজা করায় অসীম তৃপ্তি। সাধক শ্রেষ্ঠ রাম প্রসাদ বুঝি এই ভাবের অনুপ্রেরণাতেই গাহিয়া ছিলেন "চিনি হওয়া ভাল নয়রে মন,—আমি চিনি খেতে ভালবাসি।" তাই যথার্থ ভক্ত সাধক মুমুক্ষু না হইয়া ভগবৎ ভক্তি প্রার্থনা করেন। নির্ব্বাণ মোক্ষে আত্মার লয় হইয়া ভগবদ্ সাযুজ্য ঘটিতে পারে—ভক্তের পূজা নন্দের আনন্দ রসধারা ত আর উপভোগ হয় না তাই—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ দেবর্ষি নারদ নাম রস সুধা-পানে অমর হইতে চাহিয়াছিলেন, নির্ব্বাণ প্রার্থী হয়েন নাই। বিনয় তাহার পূজার অর্ঘ দেবতাকে জানিতে না দিয়াই নিরবে পায়ে দিয়া আসিত। পূজায় দেবীর শারীরী মূর্ত্তির উদ্দেশে বলিত,—"হায় কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়।"—ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া তাহার

চিন্তাস্রোতে বাধা জন্মাইয়া মুখে চোখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফুটাইয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বড় আর্শির কাছে দাঁড়াইয়া ত্রস্তহস্তে মাথার চুলগুলা গুছাইয়া লইল। ওষ্ঠেও রহস্যের মৃদু হাস্য রেখা সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। চেহারা খানা তাহার এত মন্দ নয় যে চাহিয়া দেখা যায় না, বরং থাক্ মনের কথা প্রকাশ করিয়া সে পাঠক সমাজে উপহাস্যাস্পদ হইতে চাহে না। বক্তব্য তাহার শুধু মিষ্টার রায়ের অকারণ ঘোর ঔদাসিন্য কেন! কেন সে তাঁহার হাসিমাখা মুখে কালি মাখায়—কেন তাঁহাকে খুসি করিতে পারে না! ভালবাসায় বশ হয় না জগতে এমন লোকেরও যে অভাব নাই, মিষ্টার রায় তাহাকে এইটুকুই শিক্ষা দিয়াছেন। তবু—তবু সে অসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়া একবার দেখিবে। টেবিলের উপর হইতে কাগজের বাণ্ডিল তুলিয়া লইয়া বিনয় দ্রুত পদে বাহির হইয়া পড়িল। লুব্ধ আশা কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে বলিয়া গেল "প্রতিমা নিশ্চয়ই বাড়ী আছেন, তিনি ত কোথাও যান না—হয়ত দেখা হইলেও হইতে পারে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিশোরীবাবুর ক্ষুদ্র বাসাটীতে সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই সন্ধ্যার সূচনা করিয়াছিল। ছোট বাড়ীখানির মাঝখানে একটু উঠান। দুই দিকে মিলাইয়া তিন খানি কুঠরি। একটু দালান তাহারই এক অংশ সরু সরু বাখারির ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘেরিয়া লইয়া রন্ধন গৃহ। দালানের এক দিকে কতকগুলি মাজা বাসন, জলপূর্ণ মাটীর কলসী, একটা বেতের সাজীতে বাজারের আনীত শাক সবজী রহিয়াছে, অপর অংশে শিল পাতিয়া প্রতিমা মস্‌লা বাটিতেছিল। হাত কাজে নিযুক্ত থাকিলেও উৎসুক দৃষ্টির মুহুর্মুহু দ্বারের বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে কোন বাধা ছিল না। সতর্ক কর্ণ গলির মোড়ে একখানা গাড়ী থামিবার অথবা দ্বারের বাহিরে কোন পরিচিত স্বর শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিনয় পাঁচটার সময় আসিবে বলিয়াছে। পাঁচটা এখনও আর বাজে নাই—নিশ্চয়ই বাজিয়া গিয়াছে, আজ আর হয় ত আসিলেন না। দীর্ঘ দিন যেন আজ আর কাটিয়া অপরাহ্ণে আসিতে চাহিতেছিল না। রোদের তেজও কি তেমনি বাড়িয়াছে? এত গরমে সাধ করিয়া কেহ কখনও বাড়ীর বাহির হয়—কেনই বা তা হইবেন। তাঁহারা কত বড় লোক—কত সুখ স্বচ্ছন্দে থাকেন—গরীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সুখই বা কি? তাই বা কিসে বন্ধুত্ব বলা যায়? পিতা তাহার সহিত ভাল করিয়া একটা কথাও কহেন না—এস ব'সোও বলেন না—তাঁহারা যে তবুও আসেন এইটুকুই আশ্চর্য্য! বেলার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সে দিন কিশোরী প্রতিমাকে তাঁহাদের বাড়ী, যাইতে দিয়াছিলেন। সে দেখিয়া আসিয়াছে—কত বড় বাড়ী কত লোক জন—শুধু বেলা বিনয়

নয়, তাঁহাদের মাকেও তার ভারি ভাল লাগিয়াছিল। শাস্ত্রে সে যেমন ঋষিপত্নীদের কথা পড়িয়াছিল তাঁহাকে দেখিয়া তাহার তাঁহাদের কথা যেন মনে পড়িতেছিল। সারাদিন সংসারের কাজ, পূজা অর্চ্চনায় কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন।—একখানা বোটা মটকা সাড়ী পরণে, তবু কর্ত্তিত কেশা গৌর বর্ণা কৃশাঙ্গি বিধবার মুখে চোখে এমন একটা জ্যোতি ফুটিয়া থাকে দেখিলেই সম্ভ্রম ভক্তিতে মাতৃ সম্বোধনের ইচ্ছা জাগে। প্রতিমার মাতৃহীন চিত্ত তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যেন একটা গোপন ব্যাকুলতা অনুভব করিতে থাকে। সকলের সহিত কেমন হাসিমুখে কথা বলেন! তাহাকে এত আদর করিয়া ছিলেন যে তাহার ভারি লজ্জা করিয়াছিল। তাহাকে তিনি হাসিমুখে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার কাছে লজ্জা কেন মা—আমি কি তোমার মা নই? তুমি বিনয় বেলার বন্ধু, তুমিও যে আমার মেয়ে!" সে কথাগুলি তাহার তৃষিত চিত্তে কি অজ্ঞাত অমৃতের স্বাদই না আনিয়া দিয়াছিল! সে বেলার সখিত্বে মুগ্ধ, তাহাকে জননীর স্নেহে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত, তাই বলিয়া বিনয় বাবুকে বন্ধু বলিতে অবশ্যই সাহস করে না। তিনি বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং সব চেয়ে বড় বাধা ধনবান—কেনই বা সে তাঁহাকে বন্ধু বলিবার স্পর্দ্ধা লইবে? তা'ছাড়া স্ত্রী পুরুষে বন্ধুত্ব ইহাও তাহার অভ্যাসের সংস্কারে বাধে। তিনিত তাঁহাদের আত্মীয় কেহ নহেন। পিতার বন্ধু বা স্নেহাস্পদও বুঝি নন্—তবে সেই বা কোন্ অধিকারে কোন্ সাহসে এত বড় স্পৃহনীয় সম্বন্ধের দাবী করিয়া বসিবে। তবু কি চমৎকার ভাল লোক ঐ বিনয় বাবু! প্রতিমার মনে হয় "রূপ যে গুণের অনুসরণ করে" কবির এ উক্তি এতটুকুও

অত্যুক্তি নহে! চিরদিন একা থাকিয়া তাহার স্বভাবটাও একরকম হইয়া গিয়াছিল, নির্জ্জনতাই তাহার ভাল লাগিত। লোকসঙ্গ বড়বেশী ভালও লাগিত না—প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত না।

তবু ইহাঁদের সঙ্গ তাহার কেনই যে এত স্পৃহনীয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। কেনই ইঁহার সখ্য লাভজন্য চিত্ত তাহার অতৃপ্ত হইয়া থাকে! সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে পিতা তাহার প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহার সংস্রব এড়াইয়া সরিয়া থাকিতে ও মেয়েকেও সরাইয়া লইতেই চাহেন। আবার মাসিকে ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সংবাদপত্রের সংবাদদাতার কাজেই তাঁহার যেটুকু উপার্জ্জন। অনেকদিন অসুস্থ হইয়া থাকায় কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, দেনাও কিছু হইয়াছিল। হয়ত এইসব দেনা টেনার জ্বালাতেই তাঁহার মন ভাল থাকেনা, তাই সর্ব্বদাই মন বিষণ্ণ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া আছে। শরীর যেন দিন দিন বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। আহারে রুচি থাকে না। প্রতিমা প্রত্যহ বদল করিয়া করিয়া কত যত্নে রন্ধন করে সে সব অস্পৃশ্যই পড়িয়া থাকে। ঘুম ভাঙ্গিয়া কতদিন সে দেখিতে পায় খোলা জানালার ধারে অন্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া তিনি একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। সে বিছানা ছাড়িয়া কাছে আসিলে কখন ম্লান হাসি হাসিয়া তাহাকে পুনরায় ঘুমাইতে যাইতে বলেন; কখন স্নেহভরে কাছে টানিয়া কোলের উপর তাহার মাথাটা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। অসুখ করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ম্লান হাসি হাসিয়া বলেন—"কিছু না।" তিনি যাই বলুন প্রতিমার মনে হইত নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে!—কিন্তু সে কিছুটা যে কি তাহা সে যেন

কিছুতেই ধরিতে ছুঁইতে পারে না। কোথা হইতে একখানা অন্ধকারের পর্দা আসিয়া যে পিতার স্বচ্ছ দর্পণের মত মনটিকে তাহার নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিল, এই ভাবনাটাই আজকাল তাহার অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এক এক সময় মনে হয়, হয় ত বিনয় বাবুদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করাতেই তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাই বা কেন হইবেন?—বিনয়বাবু, বেলা দুজনেইত তাঁহাকে পিতার মত মান্য করেন, অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথা বার্ত্তা কহেন। যদি বিরক্তই হন্ তবে তাহাকে লেখাটেখার সংস্রব রাখিতে মানা করিলেইত পারেন।—এই মানা করিবার অপ্রিয় চিন্তাটা মনে উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি মন হইতে সরাইয়া ফেলিল। লেখায় সে যে আনন্দ পায় প্রকাশে বুঝি তদপেক্ষা বড় কম নয়। তা' ছাড়া হয়ত বিনয় বাবুও তাহাতে দুঃখিত হইবেন। আর হয় ত আসিবেনও না। বিনয় বাবুর দুঃখিত হওয়ায় বা না আসায় তাহার যে কি ক্ষতি হইবে এইটুকুর অর্থ বোধই কেবল হয় না—মন যেন ব্যথায় ভরিয়া উঠে। তাহার রচনার কেন্দ্র যে কখন ঐ বিনয় বাবুর তুষ্টি অতুষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল সে তাহার সংবাদ জানিতে পারে নাই। লেখক ও লেখিকাদের উৎসাহ দিবার জন্য বিনয় সম্পাদকের স্বহস্তে নর্ম্মদায় সকল রচনারই মূল্য দিবার নিয়ম করিয়াছিল। প্রতিমার মনে হয় বিনয় তাহার লেখার যে মূল্য দেন তাহা যেন দ্রব্যের চেয়ে অনেক ভারী! আত্মাভিমানে আহত হইয়া মনে করিল, তাঁহার ভারী অন্যায়, কেন—যা উচিৎ প্রাপ্য তাহাই সে লইবে। দয়ার দান কেন লইবে? না সে কাহারও দয়া চাহে না। কিশোরী বাবুও সেদিন এই কথাই বলিতে ছিলেন। তিনি দয়ালু তাই গরীব দেখিয়া দয়া

করেন। বড় লোকেরা গরীবদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া নিজেদের দয়া দেখাইবার যে ভান করেন সে ও তাঁহাদের বড়মানুষীর একটা খেয়াল। প্রতিমা বুঝিতে পারে না একথা সত্য কি না। অমন সরল উদার অন্তঃকরণ—অমন মহিমাময় উন্নত ভাব এ সবই কি কৃত্রিম? দরিদ্রের প্রতি উপহাসের খেলায় এ যাতায়াতের আত্মীয়তা কে জানে কি! তিনি যে তাহার লেখায় এমন সুখ্যাতি করেন এও তবে কৃত্রিম! হয়ত—তাই, তাহার লেখা ভারী লেখা, ছাই লেখা সে।”

নেপথ্যে ডাক পড়িল “প্রতিমা!” “বাবা!” বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই কিশোরী বাবু বাড়ী ঢুকিলেন। প্রতিমা হলুদবাটা হাত খানা ঘটির জলে ধুইতে ধুইতেই প্রসন্ন হাসে মুখ তুলিয়াই দেখিল পিতা অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে তাহার পরিচ্ছন্ন কেশ বেশের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন! একটুখানি লজ্জিত ভাবে সে যেন নিজের অজ্ঞাতেই চোক নামাইয়া রইল। কিশোরীবাবু হাতের কাগজের ঠোঙ্গাটি মেয়ের হাতে দিয়া কহিলেন—“মনিবাবুর যে ছেলেটির সেদিন গাড়ীর চাকায় পা কেটে গেছ্‌ল সেটিকে আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ী নিয়ে আসা হয়েছে, এই ফল টল গুলি নিয়ে তাকে একবার দেখে আয় দেখি। সে তোকে ভারী ভালবাসে, খুসী হবে তখন খুব।” প্রতিমা একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল “আহা ছেলেমানুষ চিরদিনের জন্যে অকর্ম্মা হয়ে গ্যাল?” প্রতিমার সজল চক্ষে কণ্ঠের আদ্রতায় তাহার গভীর সমবেদনা প্রকাশ পাইল। কিশোরীবাবু উত্তেজিত স্বরে কহিলেন “গেলই বা গরীবের পা বইত নয়। বড় লোকের জুড়ীর তলায় শুধু পা কেন তার মাথাও যদি গুঁড় হবার সুযোগ পেত সেত তার ভাগ্যি!

চিত্রগুপ্তের কাছে তবু একটা বলবার থাকৃত যে ভাগ্যবানের সঙ্গে এক সঙ্গে মেশবার এতটুকু সুযোগ ও যে তার জীবনে একবার পেয়েছিল।” প্রতিমা বিস্মিত বিপন্ন দৃষ্টিতে পিতার অস্বাভাবিক উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিবার সাহসে কুলাইল না। কিছুদিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে ধনী দরিদ্রের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি যেন ক্ষোভে ক্রোধে কেমন এক রকম ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়েন। কন্যাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিশোরীবাবু পুনরায় কহিলেন “তুই না সে দিন বল্‌ছিলি ‘যাঁর গাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা ঘট্‌ল না জানি তাঁর মনে কত কষ্ট হইল’—শুন্‌বি তাঁর কি রকম কষ্ট হয়েছিল—পাছে পুলিশ হাঙ্গামে পড়্‌তে হয় বলে তিনি যে কে, কোন উচ্চ বংশ যে তাঁকে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েচে, তা জান্‌তে না দিয়েই ঝড়ের মত গাড়ী হাঁকিয়ে উড়ে চলে গেছ্‌লেন, রক্ত গঙ্গা ছেলেটা মলো কি বাঁচ্‌ল তার খবরও নেন্ নি! গরীবের ছেলে পথের কুকুর বেরালের চেয়েও ওদের জীবন যে কম দামের! দু’একটা খসে গেলেই ভাল—হাঃ হাঃ হাঃ!”

* মনিশঙ্কর স্বর্ণকার তাঁহাদের প্রতিবাসী—অবস্থাও তাহার অত্যন্ত অসচ্ছল। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর করুণা না থাকিলেও ষষ্ঠীঠাকুরাণী সে অভাবটি সম্পূর্ণ রূপে সারিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার অজস্র কৃপা বর্ষণে ছেলে মেয়ের বাড়ীতে ও হাঁড়ীতে আর স্থান সংকুলান হইতেছিল না। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ জগদীশটিই দৈবাঘাতে অঙ্গহীন হইয়া গেল। এই ছেলেটিই বাপ্-মার মনের মাঝখানে আশা ভরসার স্বর্গ। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা এড়াইয়া জীবনের

ত্রয়োদশ বর্ষ কাটাইয়া ভবিষ্যতে সাহায্য পাইবার কল্পনা নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিয়া ছিল, এমন সময় মানবের অলীক আশার অসারতা দেখাইবার জন্যই যে দিন অতর্কিত বিপদে মৃত্যু পথে অগ্রসর হইয়া আবার পরের গলগ্রহ রূপে একখানি দেহ ব্যবচ্ছেদ দণ্ড দিয়া সে ফিরিয়া আসিল সেদিন অভাগা জনক জননী অশ্রুজলে ভাসিয়াও ভগবানের দয়াটুকুকেই মানিয়া লইল। অকর্ম্মণ্য হইয়া থাক্—তবু যে বাছা প্রাণে বাঁচিয়া রহিল, এইটুকুই তাহাদের এখনকার পরম সান্ত্বনা। প্রতিমা সেদিন অন্ধকার কক্ষে লুটাইয়া বালকের দুর্ভাগ্য জীবনের জন্য কাঁদিয়াছিল। আজ সেই জগদীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, কাজ কর্ম্মে সাহায্য করিত, সেও তাহাকে কম ভালবাসিত না। আজ কতদিন তাহার রুগ্নশয্যা পার্শ্বে হাঁসপাতালে মন তাহার ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাই পিতার প্রস্তাবে মনটা তাহার ব্যগ্র হইয়া উঠিলেও একটুখানি 'কিন্তু' ও করিল। বিনয়বাবু হয়ত এখনি আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন—হয়ত আর কখনও আসিবেনও না। পিতা তাঁহাকে পচ্ছন্দ করেন না, নিশ্চয়ই তিনি আর কখনও আসিতে বলিবেনও না। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিত দৃষ্টি উঠাইয়া সে কহিল "বিনয়বাবু এখনই আস্‌বেন্ বাবা?" কিশোরী তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার লজ্জাবনত মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার অন্তরের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন "সে আমার বেশ মনে আছে বুড়ী! লোকটা যে না জ্বালিয়ে ছাড়্‌বে না তা আমি তার ছায়া দেখেই বুঝেচি! কে জান্‌ত আমার সঙ্গে বাধ সাধ্‌তেই সে আবার সম্পাদকী কর্‌তে বসেচে, সে মরেও কামড়াতে ছাড়ে নি।"

প্রতিমা বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষে পিতার ঘূর্ণমান আরক্ত চক্ষের পানে চাহিয়া কহিল,—"কার কথা বল্‌ছেন বাবা ?" বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া কন্যাকে সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় আঘ্রাণ করিয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন "তারে ভুলে যা প্রতি—সে কেউ নয়—কেউ ছিলও না কখন। তেলে জলে মিশ্‌ খায় না।" প্রতিমা ব্যথিত বিস্ময়ে পিতার বক্ষে মুখ রাখিয়াই রোদন রুদ্ধ স্বরে ডাকিল "বাবা ?" কিশোরীলাল তাহাকে বাহুবেষ্টন হইতে ছাড়িয়া দিয়া বাম হস্তে অশ্রু মুছিয়া বাধা দিবার ভাবে কহিলেন—"কিছু বলিস্‌ নি—এ অকাট্য সত্য! তর্কে বদ্‌লাবে না—বাপের চোখ ভুল দেখে না—চল্‌ তোকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ।

কিশোরী বাবুর শয়নকক্ষে একখানি অৰ্দ্ধ ভগ্ন টেবিলের ধারে দুইখানি বার্ণিশ হীন কেদারায় বিনয় ও কিশোরী বাবু বসিয়াছিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঠের আলনায় দুই তিনখানি বস্ত্র। ঘরের এক অংশে তক্ত-পোষের উপর সামান্য একটি বিছানা পাতা। একটি পুরাতন কাঁচের আলমারী, তাহার সব কয়টা তাকই বইয়ে ভরা! টেবিলের উপর কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ঘরের জানালা দরজার মাথার কাঠের তক্তা গুলা ডাক্তারী লেবেল আঁটা খালি শিশি বোতলে ভরা, কতকগুলি মাসিকপত্রও তাহার সহিত একত্রে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অস্ত সূর্য্যের ম্লান আলোটুকু কিশোরীলালের রোগ শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে পতিত হইয়া মুখখানিকে আরো ম্লান করিয়া তুলিয়াছিল। কিশোরীলাল মৃদুস্বরে কহিলেন "বুঝ্‌লে আজ ও গুলো থাক্‌। আমার মনের অবস্থা ঠিক্‌ নেই—অর্থাৎ কি না—?" বিনয় বিনয়পূর্ণ স্বরে বাধা দিল "বেশত থাক্‌ না, একটা গল্প লিখ্‌চি, কি রকম হচ্চে দেখে দেবেন শুধু, তাড়াতাড়ি কিচ্ছু নেই, যেদিন সুবিধা হবে আমায় বল্লেই আমি আস্‌ব। আপ্‌নার কাছে আস্‌বার সুযোগ আমি আনন্দের সঙ্গেই নেব।" বিনয় আজ বাড়ী ঢুকিয়াই শুনিয়াছে প্রতিমা বাড়ী নাই আর সেই সঙ্গে সেই অর্দ্ধান্ধকার ক্ষুদ্র বাড়ীখানার সবটুকু আকর্ষণ সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিশোরী বাবুর সঙ্গ তাহার কাছে এত টুকুও প্রীতিকর নয়! তবু কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার অনলস তাচ্ছিল্য সে সহিয়া থাকে। বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিলে পুষ্পের শোভা দেখিবার আশা সুদূর পরাহত হইয়া যায়। কাজ যদি মিটিয়া না যায় কিশোরীবাবু আবার এক দিন

তাহাকে আসিবার অনুমতি দেন সেত ভালই—হয়ত সেদিন প্রতিমা অনুপস্থিত থাকিবে না এবং তাহার পরে ও একটা হয়ত যোগ করিয়া তাহার কল্পনা কাঙ্খিতের দর্শন আশাটুকুও উহ্য রাখিল।

কিশোরীবাবু মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বিচলিত ভাবে কহিলেন "আস্‌বে আবার? না না মিছে কষ্ট কেন করবে, রেখে যাও, আমি সব দেখে ঠিক্ করে পাঠিয়ে দেব। প্রতিমা—সে আর লেখা টেখা দেবে না, লেখা ছেড়ে দেবে সে!"

বিনয় বিস্মিত ভাবটুকু গোপন না করিয়া তাঁহার বিচলিত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কহিল "ছেড়ে দেবেন? কেন? আমি কি আপনাদের কাছে কিছু দোষ করেচি? আপনাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করি, সাহস্ হয় না; বলুন, আমার পরে আপ্‌নি বিরক্ত হয়েচেন কি?"

তাহার শান্ত সরল দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের বিচলিত অভিভূত দৃষ্টি ফিরাইয়া কিশোরীবাবু কহিলেন "দোষ? হাঁ, না—"

আত্মস্থ হইয়া পুনরায় কহিলেন "আচ্ছা বাপু আমার উপর তোমার এত জুলুম কেন বলত? সংসারে তোমার লেখার সমজদার কি এই আমি ছাড়া আর কেউ নেই?"

বিনয় ব্যথিতভাবে কাগজের তাড়াটা টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া কহিল "হয়ত আমি ভুল বুঝেছিলুম,—আমার বিশ্বাস হয়েছিল আপ্‌নার কাছে আমি স্নেহ পাব, সাহায্য পাব, স্নেহপ্রার্থী ভাবেই তাই আমি এসেছিলুম, আমায় মাপ্ করবেন—"

কিশোরীবাবু তীব্র দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে ছিলেন, সে দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল।

ঠোঁটে তাঁর শ্লেষপূর্ণ অদ্ভূত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—"চমৎকার প্লট! গরীবের সঙ্গে বড়লোকের বন্ধুত্ব! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এ নাটকের উপসংহারটা কি রকম জমবে বল দেখি?"

তাঁহার উন্মত্তবৎ আরক্ত চক্ষু অস্বাভাবিক কথা বার্তায় বিনয়কে চিন্তিত করিয়া তুলিয়া ছিল। তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন মনে করিতে তাহার মনে যথেষ্টই সন্দেহ জাগিয়াছিল, এমন লোকের কাছে একা থাকা হয়ত নিরাপদের অবস্থা নয়, অথচ তাঁহাকে এ অবস্থায় একা ফেলিয়াই বা যায় কি করিয়া? উনি স্বীকার নাই করুণ, তবু সে, ত উঁহাদের বন্ধু বলিয়া মনের কাছে স্বীকার করিয়াছে। যদি তাহার সন্দেহ সত্যই হয়, তবে এমন দুর্দ্দিনেও যদি তাহার দ্বারা কোন উপকার না হইল,—তবে সে বন্ধুত্বেও শতধিক!

কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত সে কেবল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কিশোরী বাবু উঠিয়া গৃহ মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন।

সহসা বিনয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন— "গল্পের প্লট চাও? আমি একটা চমৎকার প্লট দিতে পারি! নেবে?"

তাঁহার উন্মত্তবৎ আকার প্রকার ও গতি ভঙ্গী দেখিয়া বিনয় ভীত হইয়াছিল। সহসা দরজার দিকে চাহিয়া সে ভয় তাহার বর্দ্ধিত হইল কখন তাহার অজ্ঞাতে কিশোরী বাবু গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সে তাহা জানিতেও পারে নাই। চাহিয়া দেখিল বাহিরে যাইবার দ্বিতীয় পথ নাই। অত্যন্ত ম্লানমুখে বিপন্ন ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আজ তবে থাক্ আর একদিন তখন? আজ আমি যাই তাহলে—"

কিশোরী হো হো করিয়া পাগলের হাসি হাসিয়া কহিলেন "না

না—যাবে কেন?—গেলে আবার আসবে যে, গল্পের বিষয়টা জেনে যাও—শেষ অংশ খুনোখুনি হলেই গল্প খুব জমে না? আচ্ছা গরীবের হাতে বড়লোকের মৃত্যু যদি লেখা যায় তো কেমন হয়?" অত্যাচারিত, পৈশাচিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত উন্মত্ত দরিদ্রের হস্তে বড়লোকের মৃত্যু! ভারি সুন্দর হবে না? হাঃ হাঃ হাঃ—"

জানালার উপর একখানা কাটারী পড়িয়াছিল। কিশোরী বাবু হঠাৎ সেই কাটারীখানা তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া বিনয়ের কাছে আসিলেন। একহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপর হস্তে দাখানি তুলিতেই বিনয় বিপন্নভাবে হটিয়া গিয়া সবলে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইল, দা সমেত ডানহাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সে আশ্চর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল,—"একি আপনি আমায় খুন করবেন নাকি?"

কিশোরী পাগলের তীব্র হাসি হাসিয়া কহিলেন—"হাতে পেয়ে বড়লোকে তাদের শীকার ছাড়ে—যে আমি ছাড়বো? তবু আমায় তুমি দোষ দিতে পারো না, আমিত তোমায় আমার লোভের কাছ থেকে সরে যেতে বারবার সাবধান করে দিয়েছি; কিন্তু তোমার নিয়তি তোমায় টেনে আনচে, তুমি সরবে কেন? বিরাজমোহনের উত্তরাধিকারী তার বিষয় ভোগ করবে আর তার পাপের ভাগ নেবে না? কিশোরীর মৃত আত্মা তার বংশের উপরেও শোধ তুলবে না আশা কর!"

বিনয়ের আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না; বহুদিনের শ্রুত অতীতের ধূলি জালের অন্তরালে লুপ্তপ্রায় যে করুণ কাহিনীর দুর্ভাগ্য নায়ক আজ ভাগ্যসূত্রে তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে তাহার অপরিচিত নয়! শৈশবে সেই স্নেহক্রোড়ে পিতৃহীন হইয়া সেও

যে একদিন গভীর স্নেহে গৃহিত হইয়াছিল; অদৃষ্টচক্রের নিষ্পেষণে তারপর কত ঘূর্ণাবর্ত্ত কত গ্রাম নগর ধ্বংশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবু তাহাদের পল্লীভবনে জমিদার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে যে জঙ্গলময় ভগ্ন অট্টালিকা লোকের মনে কত অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া দুঃখময় অস্পষ্ট স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহার অভাগা অধিকারীকে সে আজ তাহার দণ্ডদাতা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে না। এ দণ্ড তাহার উচিত দণ্ড!

বিনয় চেষ্টা করিলে কিশোরীর হাত হইতে অনেক পূর্ব্বেই মুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু সে একটুও বলপ্রয়োগ না করিয়া কেবল কৌশলে তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিয়া কাটারীখানা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ বাধা পাইয়া তাঁহার উন্মত্ততা যদি আরও বাড়িয়া যায়, তখন আর কোন উপায় থাকিবে না, এখনও আছে কিনা সন্দেহ। কিশোরীর দুর্ব্বল হস্তে উন্মত্তের বল আসিয়াছিল, বলবান যুবক শীর্ণদেহ বৃদ্ধের সহিত বলে যেন আর পারিয়া উঠিতেছিল না। সে অনুনয়ের সহিত কহিল "একটু শান্ত হোন, একটা কথা আমায় বল্‌তে দিন।"

পাগল পাগলের হাসি হাসিল। "মনে করেচ এমনি করে ছাড়ান পাবে, তা পাবে না। তা হলে তার দশাও তার মার মত হবে, না-না তার চেয়েও ভয়ানক হবে, আমি জানি হতভাগা মেয়েও যে তোমায় ভালবেসেছে। তার চেয়ে তুমিই মর।"

বিনয় সবলে তাঁহার হাত হইতে কাটারীখানা ছিনাইয়া লইয়া ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিতেই, দরজায় ঘন ঘন করাঘাত শুনিতে পাওয়া গেল "বাবা! দরজাটা খুলে দিন্ না—বাবা!"

বিনয় কিশোরীবাবুকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমাকে গৃহ প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল।

বায়ুতাড়িত বংশপত্রের মত কিশোরীবাবুর দেহ মানসিক গভীর উত্তেজনার পর প্রবল অবসাদে সঘনে কম্পিত হইতেছিল। প্রতিমা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া উভয়ের তদবস্থভাব দেখিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কিশোরীবাবু দুইহাত দিয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

বিনয় প্রতিমার দিকে একটুখানি অগ্রসর হইয়া স্নেহপূর্ণ গাঢ়স্বরে কহিল "এইমাত্র তোমার বাবা যে কথা স্বীকার করেচেন সেই অধিকারে বল্‌তে সাহস কচ্চি, যদি উনি আমায় মাপ্ কর্‌তে পারেন আমার কাকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার সুযোগ তুমি আমায় দেবে কি?"

প্রতিমা বিনয়ের গভীর ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টির সহিত আপনার বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য মিলাইয়াই চোক নামাইয়া লইল। কম্পিত ওষ্ঠাধরের বাহিরে কোন শব্দ ফুটিল না। পিতার বক্ষে মুখ রাখিয়া তাঁহাকে গভীর স্নেহে দুইখানি ক্ষীণ বাহুলতায় জড়াইয়া ধরিয়া সে কেবল ব্যাকুলভাবে ডাকিল—"বাবা!"

বিনয় কিশোরীবাবুর পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল "আপনার গল্পের শেষ আমি করে দেব—সেই হৃতসর্ব্বস্ব মহানুভব ব্যক্তি তাঁর স্বাধ্বী সহধর্ম্মিণীর শেষ অনুরোধটুকু রক্ষা করেছিলেন; ক্ষমায় তিনি তাঁর চিরশত্রুর সকল শত্রুতাকে মুছে নিয়ে দেনাশোধ করিলেন। বাবা! প্রতিমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমায় আপ্‌নার সন্তানের স্থানীয় করে নিন, আমার হতভাগ্য অভাগা কাকাকে ক্ষমা করুন!"

এতক্ষণের পর মেয়েকে বুকে লইয়া, কিশোরীর চক্ষের উন্মত্তভাব অপসৃত হইয়া অজস্র অশ্রুজল ঝরিয়া ঝরিয়া প্রতিমার কেশ-বেশ ভিজাইয়া দিতেছিল। তিনি মনে মনে কহিলেন—"ইচ্ছাময়ী মা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—"প্রকাশ্যে কহিলেন "বিনয়! সরে এস, প্রতিমা! কৈ তোমার হাত কৈ মা?"

বিনয়ের অকম্পিত হাতের উপর প্রতিমার কম্পিত হাতখানি রাখিয়া চোখের জল মুছিয়া ঊর্দ্ধ নেত্রে কহিলেন "কমলা! তবে তাই হোক সতি! তোমার ইচ্ছাই জয়ী হো'ক; এই আমার প্রতিশোধ।"

সুভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলেবেলা থেকেই বিবাহে আমার বড় বিরক্তি ছিল। বিবাহের নাম শুনিলে আমার রাগ ধরিত। মানুষ সাধ করিয়া কেন যে পরের বোঝা ঘাড়ে লয় তাহা আমি কিছুতেই ভাবিয়া পাইতাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে পরে পরুক এ শৃঙ্খল আমি কখনও পায়ে পরিব না! মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত অবাধ স্বাধীনতায় অসীম সুখে হাসিয়া খেলিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিব। কৈশোরের ইচ্ছা যৌবনের প্রতিজ্ঞায় দাঁড়াইয়াছিল। সেজন্য মধ্যে মধ্যে বিশেষরূপে দুই চারি কথা শুনিতে না হইত এমন নয়! কিন্তু সেজন্য আমার কিছুই আসিয়া যাইত না।

কলেজের আমি সর্ব্ব প্রথম ছাত্র। বরাবরই সসম্মানে সর্ব্বোপরি হইয়া আসিয়াছি। বি, এ, পাশ করিয়া মোটা স্কলারশিপ লাভ করিয়াছি। বিবাহের জন্য বিষম তাগিদ চলিতেছে। কিন্তু আমার সেই এক কথা!

মা কাঁদিয়া বলিলেন "লেখাপড়া শিখে ছেলে পুলে ভাল হয় তাই জানি,—কিন্তু আমার কপালগুণে যে এত বিদ্যে শিখে এতবড় মুখ্যু ছেলে হবে তা স্বপ্নেও কখন ভাবিনি!"

আমি বলিলাম "বাঃ দোষটা হ'ল আমার! এখন পড়াশোনার সময়—সুমুখেই এম্, এ, পরীক্ষা—এখন কি বিয়ের সময়?"

মা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অনুমানে বুঝিলাম এ যাত্রা নিস্তার পাইলাম, কিন্তু এ আশা বেশী দিন রহিল না, এম-এতেও সুযশ লইলাম

ও আইন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষিকার মত ঘটক ঠাকুর বাবাকে ও দাদাকে ঝাঁকিয়া ধরিলেন। বাবা জামালপুরে ইঞ্জিনিয়ারীং করেন, কিন্তু সেখানে পড়াশোনার তত সুবিধা না থাকায় আমি পাটনায় দাদার কাছে থাকিতাম। মাও পূজার বন্ধে এখানে আসিয়াছিলেন। সকলেই আমায় ভালবাসে এবং সুখ্যাতি করে। চারিধারে আমার বিদ্যারূপ মহাসমুদ্রের যশ রাশির তরঙ্গ উথলিয়া পড়িতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি, ছোটবেলা হইতে ঘরে পরে শুনিয়া শুনিয়া সময় সময় আমারও মনে হইত, বুঝি আমার মত ছেলে আর বঙ্গদেশে দুটী নাই! আত্মীয়ারা বলিতেন বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার মধ্যে আমি নাকি এই একটী! আমার মনে হইত ততটা না হই কিন্তু তার কাছাকাছিই বা নয় কেন? তিন তিনটা পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, সে আর সোজা নয়!—মনে কে'না কি করে! আমি না হয় নিজেকে একটু বড়ই ভাবিলাম, বাহিরে কিন্তু আমার অবিনয়ের নিন্দা ছিল না। অতি সংগোপনে আমার এ আত্মগৌরবটুকু লুকাইয়া একাই উপভোগ করিতাম। আর একজন শুধু আমার এই গোপন গর্ব্বের সাক্ষ্য ছিল—সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার আদরের ধন এক বছরের ক্ষুদ্র সুধীর।

আজ রবিবার কলেজের ছুটি তাই নিশ্চিন্তভাবে আমার পাঠগৃহে বসিয়া আমাদের দেবরভাজে বাদানুবাদ চলিতেছিল। বাহিরে বাগানে রৌদ্র ঝাঁ, ঝাঁ, করিতেছিল। ধূসর আকাশে সূর্য্য জ্বালাময় কিরণ বিতরণ করিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে পথের ধূলা ও শুষ্কপত্র উড়িয়া সমরধ্বনি করিতেছিল। রৌদ্র কাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নীরব ক্লান্তিতে কিছুমাত্র

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা কোকিল নিদাঘ মধ্যাহ্নে আম্র বৃক্ষের ঘন পত্রের ভিতর লুকাইয়া 'কুহু' 'কুহু' রবে ডাকিতেছিল। আমি বৌদিকে বলিতেছিলাম,—"বিবাহ করাটাই অত্যন্ত অন্যায়! মিছামিছি স্বেচ্ছায় রোগ, শোক, পাপ, তাপ ডাকিয়া আনিবার কোন আবশ্যক করে না, এবং পৃথিবীতে কতকগুলা অনাবশ্যক নূতন জীবের সৃষ্টি করিবারও আবশ্যক করে না। আর যদিই বিবাহ করিতে হয়,—তাহা হইলেও যাহার উপার্জ্জনের শক্তি নাই তাহার কোনপ্রকারেই ত বিবাহ করা উচিত নয়।"

কিন্তু বৌদিদি সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া বিবাহের গুণ ও আবশ্যকীয়তা প্রতিপন্ন করিতে নানামতেই চেষ্টা পাইতেছিলেন। বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর তর্কে আমার সহিত না পারিয়া বর্ষার মেঘোদয়ের মতই বৌদিদির মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। আমাদের অন্যমনস্ক দেখিয়া সেইমাত্র নিদ্রোত্থিত সুধীরচন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া গৃহস্থিত দ্রব্যাদি ফেলিয়া ছড়াইয়া মনের সুখে খেলা করিতেছিল এবং আপনার মুখামৃতে সিঞ্চিত করিয়া বিশেষরূপ আমোদ উপভোগ করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে সুমধুর কলহাস্যে সেই নিদ্রিত মধ্যাহ্নের গভীর সুপ্ততাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। অদূরে একটা বিড়াল শীতনিমিলিত নেত্রে তাহার কার্য্য-কলাপ নিবিষ্টমনে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সহসা বালকের হস্তবিচ্যুত একটা ফুলদানী সশব্দে পড়িয়া গেল। অভিমানে পুষ্পপাত্র শতধা বিভক্ত হইয়া গেল। ফুলদানীটি আমার সখের জিনিষ ছিল, সুতরাং সহসা তাহার এইরূপ শোচনীয় পরিণামে আমার একটু কষ্ট বোধ হইল। কিন্তু আর একজনের জন্য তাহা হইতেও বেশী দুঃখ হইল। সে অপর কেহই

নয় আমারই অপরাধী ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীর। কারণ সুধীরের উপর কিছু শাসন হইলে আমার মনে সেটা বড়ই লাগিত। তা সেটা বোধ হয় বৌদিদির বিশেষ রূপেই জানা ছিল, তাই তাহার অপরাধের শাস্তিটা প্রায় আমাকে দেখাইয়াই দেওয়া হইত। আজকের এ গুরু অপ-রাধের এবং তার সঙ্গে তাহার কাকার অপরাধের শাস্তিটাও অবশ্যই তাহারই প্রাপ্য। সুতরাং বালকের পৃষ্ঠে যে চপেটাঘাতটা পড়িবে তাহার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম। কিছুই বলিলাম না। কিন্তু তাহার অস্থি-দাহকারী দুরন্তপনা এবং বিশ্বছাড়া অবাধ্যতায় তাহার ভবিষ্য জীবনের ভাবনায় তাহার জননীকে একান্ত অস্থির করিয়া তুলিল। এইমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিলেও সে যে তাহার মায়ের হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে এবং পুনরায় নিদ্রিত হওয়ায় ঘোর আপত্তি করিতেছে, তাহাও তাহার জননীর বয়সে তাহার মত ছেলের দ্বারা কৃত হইতে কথনই দৃষ্ট হয় নাই। সহসা লাঞ্ছিত শিশুর অসহায় দৃষ্টি আমার চক্ষে মিলিত হইল। সে দুই হাত তুলিয়া আনন্দভরে বলিল—'আ—কাকা!'

আমি তার মায়ের কবল মুক্ত করিয়া লইয়া দুইহাতে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া মুখচুম্বন করিলাম। দুজনের দিকে চাহিয়া দুজনেই হাসিলাম। 'সুধীর আমার বড় লক্ষীছেলে!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই বৈকালে নিশ্চিন্ত মনে দাদার আজ্ঞানুসারে আমাদের নূতন প্রতিবেশী মাড়োয়ারীটীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। প্রায় দেড়মাস কাল তিনি এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহাকে একদিনও দেখি নাই। শুধু বৌদিদির মুখে মধ্যে মধ্যে মহাজনের নাত্‌নীর রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিতে পাই, সেদিকে আমি বড় মনোযোগ দিই না। সুতরাং শেষে ক্ষুন্নমনে বৌদিদি উঠিয়া যান। সে যাই হ'ক, আমি কল্পনাবলে মহাজনটীর গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ, বিশাল উদর, থানপরিহিত সহাস্যমুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বাটী উপস্থিত হইলাম। দেউড়ীতে বিশাল শ্মশ্রু রামচরণ তেওয়ারি দ্বারপাল লম্বা সেলাম ঠুকিল, বাড়ী প্রবেশ করিতেই একজন ভদ্রলোক সম্ভবতঃ সরকার মশাই হইবে;—গৃহকর্ত্তার কক্ষ দেখাইয়া দিলেন, আমি একলাই প্রবেশ করিলাম। ঘরে ঢুকিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ঘরটি সুন্দররূপে সজ্জিত, সমস্ত দেওয়ালে লতা, পাতা, ফুলকাটা, মেজেজোড়া বহুমূল্য সুন্দর কার্পেট পাতা, চারিধারে চেয়ার, মধ্যে একখানা খুব বড় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের টেবিল। টেবিলের উপর স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত বাঁধান বড় বড় অনেকগুলি পুস্তক, দেওয়ালগিরির মাথায় বড় বড় ইংরাজ, ও বাঙ্গালীর প্রতিকৃতি। সুমধুর পুষ্প সৌরভে টানাপাখার মৃদু বাতাসে সমস্ত গৃহ আমোদিত করিতেছিল। গৃহস্থিত একখানা সুন্দর সুকোমল শোফায় শুইয়া একজন শ্যামবর্ণ-দীর্ঘাকৃতি শুভ্রশ্মশ্রু-বৃদ্ধ একখানা খাতার পাতা উল্টাইতেছিলেন। বুঝিলাম

ইনিই গৃহস্বামী। নাম দাদার কাছেই শুনিয়াছিলাম প্রতাপরুদ্র সিংহ। আমার কল্পনাদেবী মস্তক নত করিলেন।

প্রতাপবাবু সহাস্যমুখে আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বড় সুন্দর লোক। এমন অমায়িক, সরল, সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। কথায় কথায় সকল সংবাদ শুনিলাম। লক্ষ্ণৌএ এঁর কারবার আছে, সেইখানেই থাকা হয়। সম্প্রতি শরীর অসুস্থ হওয়ায় এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছেন। প্রতাপবাবুর পুত্র সন্তান নাই, একটী মাত্র কন্যা। শরীর অসুস্থ সেই জন্য কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন না তজ্জন্য বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বড় আনন্দ পাইলাম।

সেই হইতে যখন তখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমার সিংহমহাশয়কে বড় ভাল লাগিত, তাঁহার সরল স্নেহপূর্ণবাক্য, সুহৃদবৎ ব্যবহারে আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহার মুখে নানা দেশের অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া আমি তাঁহার বহুদর্শিতার প্রশংসা মনে মনে করিতাম। প্রতাপবাবুও আমায় প্রত্যহ যাইবার অনুরোধ করিতেন। আমিও সানন্দ চিত্তে তাঁহার এই অনুরোধ পালন করিতাম, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী এম, এ হইয়াও এ বিষয়ে আপনাকে একটুও মানহীন বোধ করিতাম না। ইহাই আমার বর্ত্তমান দিবসের সুখ দুঃখের প্রথম স্হচনা। আর এজন্য প্রিয়বন্ধু হিরণ্ময় ও নলিনাক্ষের নিকট হইতে মৃদুমধুর অনুযোগও না সহিতে হইত এমন নয়।

আজ কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় একটু বেলাবেলিই সিংহমহাশয়দের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখি তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পরিত্যক্ত শোফায় ঘরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া একটী বালিকা কি একটা পুস্তক পাঠ করিতেছিল, বোধকরি আমার পদশব্দেই সে মস্তক হেলাইয়া পশ্চাতে চাহিল এবং পরক্ষণে হস্তস্থিত পুস্তক নামাইয়া রাখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখি নাই, তাই বিস্মিত ও একটু কৌতূহলী নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম। মেয়েটী সুন্দরী। ভুবনমোহন রূপরাশি তাহার ক্ষুদ্রদেহে উছলিয়া পড়িতেছিল। ইতিপূর্ব্বে আমার মনে মনে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যত সুন্দরীই হ'ক বাঙ্গালীর মেয়ে কখন উপন্যাসের নায়িকার মত সুন্দরী হইতেই পারে না। কিন্তু আজ আমার চিরদিনের সে দৃঢ়বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল। বালিকা প্রভাত সূর্য্যের মত দীপ্ত লাবণ্যময়ী। তাহার বন্ধনহীন মুক্ত কেশরাশি অবাধে মুখে বুকে ললাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঈষৎ ঘর্ম্মে কুঞ্চিত অলকাবলী ললাটে জড়াইয়া আছে। আমি বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুখের বিষয় বালিকা আমার সে বিস্মিত বিহ্বলভাব বুঝিতেও পারিল না। সে ভালই হইল, বুঝিতে পারিলে না জানি সে কি মনে করিত। বেশ সরল প্রশান্তভাবে যেন কতকালের পরিচিতের মতই বালিকা বলিল—"দাদা আজ পাটনা গেছেন, বোধ হয় আজ আর ফিরে আস্‌বেন না।"

রূপের মত বালিকার স্বরও কি তেমনি মধুর! কিন্তু সেজন্য কেহ যেন দোষ ভাবিও না, যাহা সত্য মাত্র তাহাই বলিলাম, অবশ্য বালিকাকে দেখিয়াই কিছু আমার মনে অনুরাগের উদয় হয় নাই।

সে বড় সুমিষ্টভাবে আমায় বসিতে অনুরোধ করিল। অনুরোধ সকলেরই রাখা কর্ত্তব্য, তাই আমিও তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম না। করিবার ইচ্ছাও ছিল না। বসিতেই তাহার পরিত্যক্ত পুস্তকের উপর দৃষ্টি পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলাম 'ওখানা কি বই ?'

সে একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "রঘুবংশ"।

আমি হাত পাতিয়া বলিলাম, 'দেখি !'

বালিকা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে বইখানা আমার হাতে দিল। সে যেখানটা পড়িতেছিল সেখানে একটা চিহ্ন দেওয়া ছিল। প্রথম পৃষ্ঠা উল্‌টাইতেই সেই খানটা বাহির হইয়া পড়িল। দেখিলাম, আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "তুমি এসব বুঝিতে পার নাকি ?"

সে বলিল—"পারি।"

সহসা বইখানার উপর পৃষ্ঠায় দেখি একপাশে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে নানা বর্ণের কালিতে লেখা আছে 'সুভা'।

আমি একটু সহাস্যভাবে বলিলাম—"তোমার নাম সুভা, নয় ?"

সে তাহার বড় বড় চোকের বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল—"আপ্‌নি কি করে জান্‌লেন ?"

আমি বলিলাম—"আমি গুণ্‌তে জানি, তুমি জান আমি কে ?"

সুভা এবার সহাস্যমুখে বলিল—"তা আর জানি না !"

"কে বল দেখি ?"

সুভা একটু ব্যস্তভাবে বলিল—"কেন আপনি ত শরৎবাবু ?"

আমার নাম শরদিন্দু হইলেও লোকে আমায় শরৎ বলিয়াই ডাকিত।

আমি আশ্চর্য্যভাবে বলিলাম—"তুমি কি করে আমার নাম জান্‌লে !"

সুভা সহাস্যমুখে বলিল—"কেন আপনি রোজ এখানে আসেন, দাদা আপনার কত গল্প করেন।"

আমি আর উত্তর দিলাম না কারণ আমার মত লোককে সকলের জানাটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, না জানাটাই আশ্চর্য্য!

সুভা বড় চঞ্চল, ইতিমধ্যেই সে অনেক কথা বলিল। তার ময়নাটা কেমন "দিদি" বলে ডাকে। আর সে কাছে গেলেই কাকাতুয়াটা কাঁধে এসে বসে। বাড়ীতে তার কত পায়রা আছে—সে তাদের বড় ভালবাসে, তার ছোট বোন বিভা 'অতটুকু মেয়ে' তবু পায়রাগুলো তাকে ভয় করে। আর সুভাকে একটুও ভয় করে না। সে বাড়ীতে আপনি গোলাপ গাছ পুঁতেছে, তাতে কত বড় বড় ফুল হয়, তার দাদার বাগানে একটাও তেমন ফুল নেই! এমনি সরল আগ্রহের সহিত বালিকা তাহার প্রিয়বস্তু জাতের কথা বলিতেছিল যে আমার মত গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরও অত্যন্ত আনন্দপ্রদ মনে হইতেছিল। আসিবার সময় সুভা আমায় আবার তাহাদের বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করিল, এবং এবার যেদিন যাইব সেদিন তাহার মেণি, ফেঁতিকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। আমিও সানন্দচিত্তে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইহাতে দোষ ভাবিও না। সুভা দ্বাদশ বর্ষীয়া চঞ্চলা ক্ষুদ্র বালিকা; সুতরাং ইহাতে তাহার পক্ষ হইতে ভালবাসার ভয় নাই। আর আমি ত ঘোরতর বিবাহ বিরোধী। তবে সৌন্দর্য্যের ও সরলতার পক্ষপাতী কে নয়? সুভা সুন্দরী, সুভা সরলা, সুভা বালিকা!

সেই হইতে মধ্যে মধ্যে যাই, সুভাও আমাদের বাড়ী আসে। এই অল্পদিনের মধ্যেই সুভার সহিত বেশ ভাব সাব হইয়াছে। সে বয়সের

অপেক্ষাও ছেলেমানুষ, আমার কাছে তাদের বাড়ীর তার ছোটবোনটীর, তার গাছপালা, পাখী, পায়রার কত গল্প করে, আমি ওসব কথায় কান না দিতে পারিলেও অন্যমনে সবেতেই সায় দিয়া যাই।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুভা! তোমরা ত শীঘ্রই দেশে ফিরে যাবে, সেখানে গিয়ে আমাদের জন্য মন কেমন কর্‌বে না?"

সে একটু ভাবিয়া বলিল 'তা বোধ হয় কর্‌বে!'

উত্তর শুনিয়া মনে রাগও হইল, দুঃখও হইল, বলিলাম--"তা কেন কর্‌বে সেখানে কত লোক আছে!"

বালিকা আমার অভিমান বুঝিল না, সহাস্যমুখে উত্তর দিল; "সেখানে ত বেশী লোক নেই। শুধু সুশীল আর বিপিন আছে, তারা আমায় খুব ভালবাসে, তাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে"—বলিতে বলিতেই সুভার বড় বড় চোক ঈষৎ সজল হইয়া উঠিল। সেই অজ্ঞাত সুশীল এবং বিপিনের উপর কি জানি কেন বড়ই রাগ হইতে লাগিল। তারা সুভার মনের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিল কেন?

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে একবৎসর কাটিয়া গেল।

রাত্রে আহার করিতে বসিয়াছি, কাছে বসিয়া বিনা কারণে মা বাতাস দিয়া কল্পিত মশা মাছি তাড়াইতে ছিলেন! বুঝিলাম আজ একটা বিশেষ কোন কথা আছে। কিন্তু আমি নিতান্ত শান্ত, সুবোধ ছেলে কিছুই বুঝিতাম না; তাই মাথা নিচু করিয়া একান্ত মনে খাইতেছিলাম, বহুক্ষণ পরে প্রদীপে দুইটা সলিতা দিয়া উহা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মা বলিলেন—"শরৎ! বাবা—একটা কথা বল্‌ব, শুন্‌বি?"

আমি মার মুখের দিকে চাহিলাম, উত্তর দেওয়ার আবশ্যক ছিল না।

মা বলিলেন এই ২৫শে খুব ভাল দিন আছে, আর মেয়েটীও দিব্যি, ঐ খানেই বিয়ে কর্!"

এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া মা আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কেমন আপনা হইতেই আমার মাথা নীচু হইয়া পড়িল। মনে মনে মার কথায় একটু আনন্দ হইলেও প্রকাশ্যে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তোমার কেবল ঐ এক কথা। বলেইছি ত এখন পড়া শুনার সময়—"

মা বাধা দিয়া বলিলেন—"সে সব যা হয় হবে। তোর ত চিরকেলে ঐ কথা। আমি এবার আর কোন ওজোর শুন্‌চি না। এই ২৫শেই দিন স্থির করে ওদের বলে পাঠাই।"

আমি যেন নিতান্ত অনিচ্ছার দায়ে পড়িয়া একটু গাঁই গুঁই করিয়া সম্মত হইলাম, অর্থাৎ মৌনাবলম্বনে রহিলাম। মৌন যে শাস্ত্র সঙ্গত সম্মতি লক্ষণ, মাও বোধ করি সে কথাটা জানিতেন, কেন না একটু রহস্য-পূর্ণ সানন্দ—হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে দেখা দিল। আমি মাথা হেঁট করিলাম—কেহ দেখে নাই ত! কপাটের পার্শ্বে অলঙ্কার নিক্কন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ বৌদিদির কৌতূহলী চক্ষু এড়াইতে পারি নাই! যাহা ভয় করিয়াছিলাম, কার্য্যতও তা—ই হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ ১৩ই আষাঢ় সকাল হইতে মেঘ করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মেঘ কাটিয়া বৃষ্টি বিধৌত বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপর বৃষ্টি বিন্দু শোভিত তৃণের উপর সুমধুর চন্দ্রকিরণ জ্বলিতেছে, মুক্ত বাতায়নে চাঁদের ম্লান আলো আমার মুখে বিছানায় রজত রশ্মি ছড়াইয়া দিয়াছে। ঘরের নীচেই ফুলের বাগান, বাতাসে রজনীগন্ধার সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। মুক্ত বাতায়নতলে চাঁদের আলোয় শুইয়া আমি পড়িতেছিলাম—অমর কাব্য মেঘদূত—

> "গত্বা বোর্দ্ধং দশমুখ ভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থ সন্ধোঃ।
> কৈলাসস্য ত্রিদশ বনিতা দর্পণ তিথিঃ স্যাঃ।
> শৃঙ্গস্থায়ৈঃ কুমুদ বিশদৈর্যোষিতঃ ত্যস্থিতঃ যং।
> রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্ট হাসঃ"।

বাহিরেও বড় মধুর সৌন্দর্য্য, নীল নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের কিরণ, সজল কোমল বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি; আর ফুলের সহিত আর্দ্র মৃত্তিকার গন্ধে কেমন একটা মধুর সৌরভ উত্থিত হইতেছিল। 'যক্ষ রমণীর বিরহ বেদনা, চকিত চঞ্চল নয়নের ন্যায় দৃষ্টি পড়িতে পড়িতে আমার সুভার কথা মনে পড়িতেছিল। সুভা আজ কাল বড় গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। আমার কাছে আসে না, দৈবাৎ দেখা হইলে অজ্ঞাতে চারি চক্ষুর চাওয়াচায়ি হইলে, চোক নীচু রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়; বুঝি ঈষৎ বিরক্তির ছায়া তাহার সুন্দর মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু না, সেটা হয়ত আমারই ভুল। সুভা ত আমায় ভালবাসে! একদিন

সন্ধ্যাকালে, সেদিনও এমনি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল, আর ততোধিক সুষমাময়ী আর একখানি মুখ ও বড় মধুর হাসি হাসিতেছিল। বাগানে সুভা একাকিনী ফুল তুলিতেছিল, আমায় দেখিয়াই তাড়াতাড়ি পালাইতে গেল, তার সযত্ন সঞ্চিত জুঁই ফুলগুলি ব্যস্ততায় ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। তবুও সুভা পলাইতেছিল, আমি তার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। সহসা আহতা ফণিনীর মত সদর্পে মাথা তুলিয়া সুভা বলিল—"হাত ছেড়ে দিন,"—সঙ্গে সঙ্গে একটু বল প্রকাশও যে না করিল এমন নয়।

আমি হাস্য মুখে বলিলাম "কেন ছাড়ব? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে জান ত?"

একটু ক্রুদ্ধ স্বরেই সুভা বলিল—"মিথ্যা কথা! আমায় ছেড়ে দিন।"

সুভার সেই ঈষৎ লজ্জা ঈষৎ রাগ-রক্তমুখে চাঁদের আলো পড়িয়া তাহার বিশ্ব বিমোহন রূপরাশি আরও মধুরতর করিয়াছিল। সেই রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় অপূর্ব্ব রূপরাশিতে আমার তৃষিত নেত্র মুগ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে আপনার অজ্ঞাতে, কারণ তখন আমার মনে আর কিছুই ছিল না। বলিলাম—"সুভা তুমিও কি আমায় ভালবাস?"

অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে সুভা বলিল—"না! একটুও না! ছেড়ে দিন আমায়!"

হাত ছাড়িয়া দিলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সুভা চলিয়া গেল, একবার পশ্চাতে চাহিলও না। সুভার রূপের মত তাহার হৃদয় মধুর নয়। সুভা ত বড়ই নিষ্ঠুর! শুনিয়াছি সুভার সহিত আমার বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে। সত্য সত্যই সুভা আমার হইবে।

তখন তাহার এ হৃদয়হীনতার প্রতিশোধ কিন্তু আমি না লইয়া ছাড়িব না।

একদিন নলিনাক্ষ উপহাস করিয়া বলিল—"কিহে আজ কাল বিবাহ বিরোধিনী সভার সভ্য হবে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হব না কেন?"

বন্ধু রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন "আমার সঙ্গে প্রতারণা? আমরা ত আর ভাগ নিতে চাচ্চি না! হলই বা সুন্দরী!"

সেও কি আবার কথা! কাজে কাজেই আবার তাহার রাগ ভাঙ্গাইতে সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল। অবশ্য সুভাকে বিবাহ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু সেটা কেবল মাত্র বাপ মায়ের অনুরোধের দায়ে; আমার নিজের দিক হইতে ইহাতে একটুও স্বার্থ নাই, এমন কি, এতদুর অগ্রসর হইয়া এখনও এ বিবাহ যদি না হয়, তাহাতে আমি একটুও দুঃখিত নই।

নলিন কিন্তু একথা যে বিশ্বাস করিল না তাহা বলাই বাহুল্য—বলিল,—"ঈশ্বর না করুন, যদি তেমনই হয়—তা'হলে তখন দেখা যাবে! এদিকেত কোর্টশিপও চালাচ্চো?"

কেন কে জানে এদিকে মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। আর ভাল করে কথা পর্য্যন্ত কইতে পারিনি।

আজ কিন্তু এই নির্জ্জনে মেঘদূত হাতে একাকী পূর্ব্বকথা ভাবিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। আর বিরহিনী যক্ষ-পত্নীর সহিত সুভার তুলনা করিতে গিয়া কালিদাসের অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার বিষয় ভাবিয়া মনমধ্যে আশ্চর্য্য হইতেছিলাম। সম্ভবতঃ বৃদ্ধকালে কবির "ভীমরথি" হইয়াছিল।

সেদিন বৌদি'র সঙ্গে তর্কের মাঝখানে কে জানে কি বেফাঁস

বলিয়া ধরা পড়িয়া গেলাম। বৌদি বল্‌লেন—"ওঃ হরি! এমন কথা; তা এতদিন বলিতে হয়! আমরা ভাবি ঠাকুরপো বুঝি সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসীই হবে, কি দেশ উদ্ধার করতেই বেরুবে, অথবা কলিযুগের লক্ষণই বা হবে! তা নয়! তুমি চাও একটা আস্ত উপন্যাসের নায়িকা, মিরাণ্ডা, দেস্‌দিমনা, কিংবা আয়েসা, তিলোত্তমা হলেও কতক মতক বা চল্‌তে পারে। এই ত কথা? তা এতদিন বল্‌লেই হ'ত। কত তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা গড়াগড়ি যেত। তা'হলে কিন্তু ভাই আমাদেরই ভারি মুস্কিল হবে। বাড়ীর ভেতর লক্ষ লক্ষ যবন সৈন্যই হুট হুট করে প্রবেশ কচ্চে। এলোচুলে আম্র বনের অন্ধকারে শ্মশানে মশানেই হয়ত বৌঠাকরুণ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!"

"ওগো, থাক্ থাক্ খুব হয়েচে! আমি বুঝি সেই কথাই বলেচি,—"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ বোঝা গ্যাচে,—তাই সিঙ্গিদের সুভার অত সুখ্যাতি হয়। আমিও ত তাই ভাবি!—যে সুভার নামে ঠাকুরপোর নাল পড়ে কেন! এদিকে যে লক্ষণ ঠাকুর এরি মধ্যেই—"

আমি অপ্রতিভ ভাবে বাধা দিয়া বলিলাম—"না বৌদিদি আমি সু-সু-সুভাকে বি'য়ের কথা কেন—আমিত ওসব কথা কিছুই ভাবি না।"

নাঃ—বৌদিদিরই জিত। যাহা জীবনে প্রকাশ করিব না ভাবিয়াছিলাম, বৌদিদির কাছে লুকাইতে পারিলাম না। উপসংহারে সুভা ভিন্ন যে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না তাহাও বলিয়া ফেলিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে টেবিলের কাছে বাতির আলোয় একখানা আইনের বই দেখিতেছি; বৌদিদি আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন।

এমন অসময়ে ত একদিনও তিনি আসেন না! আমি একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলাম—"খপর কি ?"

বৌদিদি উত্তর দিলেন না, তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম সংবাদ বড় শুভ নয়! বড় ভয় হইল বলিলাম—"সুধীর ? সুধীর কেমন আছে বৌদিদি ?"

একটু হাসিয়া, কষ্টের সময়েও মানুষ হাসে,—সেই রকম ম্লান হাস্যের সহিত বৌদিদি বলিলেন—"এই চিঠিখানা মা দিলেন পড়ে দেখ।"

হাত পাতিয়া লইলাম, বুঝি একটু হাতটা কাঁপিয়াছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

"প্রিয় পূর্ণেন্দু! তোমার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েচি। উত্তর দিতে বিলম্ব করিলাম, ইচ্ছা করিয়া করিলাম, কারণ শুভ সংবাদ যত শীঘ্র দিতে পারা যায়, অশুভ সংবাদ তত শীঘ্র পারা যায় না। যাক সে কথা, তুমিত জানই শরদিন্দুর সহিত—আমার সুভার বিবাহ দিতে আমার একান্ত অভিলাষ, কিন্তু কি করিব উপায় নাই। মেয়ে ত আমার নিজের নয়। জামাতা বাবাজি রাজপুর না রামপুরে এক পাত্র স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বাগদত্তও হইয়াছেন, বিবাহ ঐ তারিখেই হইবে ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। আগে জানিলে মিছামিছি তোমাদের মনক্ষুণ্ণ হইতে হইত না, যাই হোক বিধি লিপি অখণ্ডনীয়, তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র। আর শরদিন্দুর মত ছেলের জন্য কত সুন্দরী মেয়ে তপস্যা করিতেছে। ওর বিয়ে ত ভাবনার বিষয় নয়! এখানকার সব উপস্থিত মঙ্গল। আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে তোমাদের কাছে ভাল করে বিদায় লইতে পারি নাই। আর দেখ বাবা! শরতের বিয়ের নিমন্ত্রণটায় যেন আমরা বাদ না

যাই। তার টুকটুকে বউটী অবশ্য আমরা দেখলেই দৃষ্টিতে শুকিয়ে যাবে না। শরৎকে ব'ল তার কাছে বিদায় না নিয়ে আসার জন্য যেন কিছু মনে না করে। তার কথা আমি কখনও ভুলিব না।

শুভার্থী—

প্রতাপ

চিঠি পড়িয়াই মাথা ঘুরিয়া গেল। চারিদিক যেন শূন্যময় মনে হইতে লাগিল। কি পড়িলাম, কি দেখিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বহুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম, তিনিও আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, আমায় চাহিতে দেখিয়া চক্ষু নত করিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তাদের মেয়ে নাই বা দিলে,—অমন মেয়ে কি আর পাওয়া যাবে না নাকি!"

ক্রোধে দুঃখে অপমানে আমার হৃদয় পুড়িতেছিল, একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলাম,—"বলিয়াছিই ত সুভাকে ভিন্ন বিবাহ করিব না, আর বিয়েতে আমার ত কখনই আগ্রহ ছিল না সেত জানই—"

বৌদিদি চলিয়া গেলেন। একাকী বাতায়নে আসিয়া বসিলাম, সুভার উপর বড় রাগ হইল। সেকি কোন প্রকারে জানাইতে পারিত না! তার মত থাকিলে প্রতাপ বাবু দৌহিত্রীকে যেরূপ স্নেহ করেন, কখনই তার অনিচ্ছায় বিবাহ দিতে দিতেন না। কিন্তু হায় দুরাশা! আমারই ভুল! সুভাত আমায় ভালই বাসে না! সে কথাত সে নিজ মুখেই স্বীকার করেছে। কিন্তু তবু, তবুত তাহার আশা ছাড়িতে পারি না! হায় সুভা! কেন তোমার ও বিশ্ব-বিনোদন অতুল রূপরাশি

লইয়া আমার সৌন্দর্য্য তৃষিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইলে? কেন আমার আজীবনের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে আমায় বিচ্যুত করিলে? তুমি প্রতিভাময়ী স্বর্গের দেবী, তোমায় কি গুণে আমি প্রার্থনা করিব! তুচ্ছ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি আর তুচ্ছ এ বিদ্যাশিক্ষা, আজ কোথায় সে আত্ম গৌরব? একটা ক্ষুদ্র বালিকাকেও যে বশীভূত করিতে পারিল না।

"আশাবিজলি ক্ষণ, চমক বিলাসে,
পূরল তমস বিষাদে।
লীলস পরবশ, হৃদয় প্রণোদিত,
সাহস মুরলী নিনাদে——"

কিন্তু হায় আশার চমকই সার! সেই সন্ধ্যা-ধূসর তরুচ্ছায়া-ঘন ম্লান চন্দ্রালোকে বাতায়নে বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাগানের দিকে চাহিলাম। মৃদুসৌরভ রমনীয় সুকোমল-পুষ্প-সৌগন্ধ-লুণ্ঠনকারী সন্ধ্যার বাতাস উদ্দাম উল্লাসে ঘরের বাতিটা নিবাইয়া দিল, এবং ধীরে ধীরে স্নেহ সুকোমল হস্তে যেন আমার ললাটের কেশ লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মধুর প্রীতি প্রকাশ করিতেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নেই কাটিয়া গেল।

পরদিন কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। বিশেষতঃ বৌদিদি সে কথা স্পষ্টতই প্রকাশ করিলেন। মা বড় চিন্তিত হইলেন, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন সহসা এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় হয়ত ছেলেকে শয্যাগতই করিবে, কি এমনি কিছু একটা কোন দুর্ঘটনাই বা ঘটিয়া যাইবে, যা সাহস করিয়া ভাবিতেও পারা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহাদের এ

প্রকার ব্যবহারে মা বড়ই চটিয়াছিলেন ; তাঁহার এম, এ, ছেলের গৌরবে সহসা এরূপ অন্যায় ভাবে আঘাত করা তাঁহার অত্যন্ত বিস্ময়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাই এখন তিনি দেখাইতে চান তাঁর ছেলে বড় যে সে লোক নয়, ইচ্ছা করিলে এমন কত শত সুন্দরী তাঁর ছেলের পদানত হইতে পারে। আজ কিন্তু মার কথায় আমার হাসি আসিল, আমার নিজের গৌরব আত্মাভিমান অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইতেছিল যে।

মা বলিলেন—"বাবা! বিয়ে কর, লোকে যে মুখ বাঁকিয়ে বলবে বিয়ে ওরা দিলে না ব'লে হলো না, তা আমি সইতে পারব না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আগে পরীক্ষার ফলটা বেরুক ত!"

মা অপছন্দ করিলেও সম্মত হইলেন, বলিলেন—"ফলতো জানাই আছে বাপু, ওর আর বেরুনো না বেরুনোর তফাৎ কি! একি আর কেউ যে ভাবনা হবে।"

আমি দিন কতকের জন্য অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এ কথাও ত বেশী দিন খাটিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"না শরৎ! সত্য সত্যই তোমার নাম নাই!"

"তুমি ঠাট্টা কচ্চ, কৈ দেখি!"

"এসব কথা নিয়ে কি ঠাট্টা করবার", বিষণ্ণ মুখে নলিন আমার হাতে গেজেটখানা দিল।

তখনও কিন্তু হাস্য মুখেই গেজেটখানা লইলাম, বুকের ভিতর ধড় ফড় ধড় ফড় করিতেছিল। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই দেখি প্রথম বিভাগ,—হিরণ্ময়, জ্যোতিন্দ্র, হেমেন্দ্র, অরুণপ্রকাশ, বিজলিভূষণ, বিভাস কুমার, প্রতিভাকান্ত, দ্বিতীয় বিভাগ,—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কই—এতেও ত নেই! তৃতীয় বিভাগ একটু ইতস্ততঃ একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিলাম, পাছে সমস্ত নামগুলাই ফুরাইয়া যায়। তাই বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল।

কি আশ্চর্য্য! আমার নামে পর্য্যন্ত একটা ছেলে পাশ করে নাই! যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে চাহি নাই, তাহাই সত্যে পরিণত হইল! নিতান্ত হতাশ ভাবে অবজ্ঞা ভরে কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলাম। নলিনাক্ষ এতক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়াইয়া জামার বোতামগুলো ভাল করিয়া আঁটিয়া দিয়া কম্ফটারটা মাথার উপর দিয়া জড়াইয়া একটা বেতের ছড়ি দিয়া ঠুক্‌ঠুক করিয়া জানলায় আঘাত করিতেছিল। আমার দিকে সহসা ফিরিয়া ছড়িটা মাটিতে আস্তে আস্তে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল,—"সত্য সত্যই কথাটা অবিশ্বাস্য! আমি কিন্তু ঠিক ভেবেছিলুম তুমি একজামিনে ফার্ষ্ট

হবেই !"—গম্ভীর ভাবে আপনার বক্তব্য শেষ করিয়াই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া গেজেট খানা কুড়াইয়া লইয়া পুনশ্চ দেখিতে লাগিল। কি মধুর সহানুভূতি! আমার ত অঙ্গ জল হইয়া গেল। সমস্ত বিশ্ব জগতের উপর হাড়ে চটিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও কিছু পড়িব না। স্বার্থপর বিশ্ব-বিদ্যালয় গুণের মর্য্যাদা জানে না! নিশ্চয়ই পরীক্ষকের দোষে এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল, আমার ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই। নলিন মুখ তুলিয়া দুই একটা সান্ত্বনার কথা বলিল। আমি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সেগুলাকে উড়াইয়া দিলাম। ফেল হওয়ায় যে আমি দুঃখিত, বা আমার মর্য্যাদার ইহাতে কিছুমাত্র লাঘব হইল, এমন কথা মোটেই তাহাকে জানিতে দিলাম না। আমার বিরক্তি বুঝিয়াই বোধ হয় নলিনও চুপ করিয়া রহিল। আমিও আপনার ভবিষ্যৎ ভাবনায় অস্থির হইতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পর ফকির আসিয়া নীরবে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল এবং অতি মৃদুভাবে দাদার আহ্বান সংবাদ দিল। কি বলিয়া আজ দাদার কাছে মুখ দেখাইব। লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনার বিষন্ন-ক্লিষ্ট মুখ ঢাকিয়া দাদার ঘরে গেলাম। ঘরে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতে ছিল; দাদা চেয়ারে বসিয়া কতকগুলো মোকদ্দমার কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। আমায় দেখিয়া হাতের কাজ রাখিয়া বসিতে বলিলেন, অপরাধীর মত সঙ্কুচিত ভাবে একপাশে বসিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দাদা বলিলেন,—'শরৎ! শুনেচ বোধ হয় বাবার ছুটি মঞ্জুর হয়নি, তাই তোমার মাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য বলেছেন, বিশেষতঃ সেখানে গেলে তোমার ও উপকার হবার সম্ভাবনা। তুমি কি বল?'

দাদা আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম।

পরদিন রাত্রে যাত্রা করিব বলিয়া স্থির হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আর ভাল দিন নাই। আমার পড়াশোনা ইত্যাদি কোন বিষয়েই দাদাও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, আমিও বলিলাম না। আমি ত তখন পরিচিত বন্ধুদের ছাড়িয়া যাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়াছিলাম। আমার তখন কেবল মনে হইতেছিল—

'ঊষা কত আশাময়ী, ডেকে নেছে অমানিশা,
প্রাণের প্রান্তরে কত অশনির ঘটা।
প্রতি ভুল ভেঙ্গে গ্যাছে, প্রতি পদে বিঁধিতেছে,
অনভিজ্ঞ জীবনের রক্ততৃষ্ণ কাঁটা।
'হৃদয়ে হুঁচট লাগে, আজন্ম শিহরি জাগে,
মহাত্রাসে কক্ষ পাশে ঝুঁকে পড়ে প্রাণ।
বাসনার বালি-ঘর, ভাঙ্গি গড়ে নিরন্তর,
ভূমিকম্প আছে সেথা নাহি ছিল জ্ঞান॥

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা জামালপুরে আসিয়া পৌছিলাম। বাবা নিজে ষ্টেশনে আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমরা নামিবার পূর্ব্বেই তিনি সহাস্য মুখে নিকটে আসিলেন। আমি মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। বাবা কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না, বরং আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন।

আজ প্রায় পনের দিন এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তবুও মনের সুখ পাইলাম না। সর্ব্বদাই মনে কি একটা অতৃপ্তির ব্যথা লাগিয়া থাকে।

জামালপুর কল কারখানার নিমিত্ত বিখ্যাত এবং ছোট খাট সহর হইয়াও তাহা পল্লীগ্রাম বিশেষ। এখানে অনেকগুলি অট্টালিকা ও বড় বড় কারখানা ঘর থাকায় স্থানটী দিব্য শ্রীসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। এখানে ভদ্রলোকের নিত্য ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদিই পাওয়া যায়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালীও এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করায় একপ্রকার এখানকার অধিবাসী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। এখানে এই অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে থাকিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, বিশেষতঃ দিবারাত্রি কলের ধোঁয়া আর শব্দ আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় একদিন আমার বাল্যবন্ধু দেবেন্দ্রের (এখন গয়ার মুন্‌সেফ্) একখানা চিঠি পাইলাম। দেবেন মধ্যে আর একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, এবারে লিখেছে—

গয়াধাম

২৫শে জানুয়ারী

শনিবার রাত্রি

প্রিয়তম শরৎ!

আজ আবার অনেক দিনের পর তোমায় চিঠি লিখ্‌চি। তুমি বোধ হয় আমার প্রথম পত্র পাইয়াছ।

শুনিলাম ফেল্ হওয়ায় তুমি বড় দুঃখিত হইয়াছ। হইবারই ত কথা। এক একটা বছর মাটি! কিন্তু কি করবে বল অদৃষ্টের উপর ত জোর নাই। অবশ্য এমন কথা বলি না, যে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে অদৃষ্ট আপনি আসিয়া হাতে তুলিয়া দিবে। চেষ্টা চাই বই কি, জানই-ত 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি

লক্ষী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি—' যাক্ সে কথা। তুমি কি অদৃষ্ট মান? আমিত খুব বেশী রকমই মানি। ভাই, অবিমিশ্র সুখভোগ কাহারও হয় না। আবার নূতন বলে নবীন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, অবশ্যই সুফল পাইবে। ভাই, নিরাশ হইও না। চেষ্টায় মানুষে কি করিতে না পারে? আজ না হয় কাল হইবে। চেষ্টায় মানুষ আকাশে উঠচে, কত অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করচে—রোম রাজ্যের পত্তন কিছু একদিনেই হয় নাই।

শুনিলাম সুভার সহিত নাকি তোমার বিবাহ হইল না, এর মানে কি? সত্য সত্যই অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন এক সঙ্গেই সমস্ত বিপদ আসে। বাস্তবিক কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এ রকম করে আশা দিয়ে নিরাশ করা বড়ই অন্যায় তাঁদের। ভাই শরৎ! তুমিই-ত কত বার বলেছ এ সংসার পরীক্ষার স্থান, এ থেকে যে উত্তীর্ণ হইতে পারে সেই যথার্থ মানুষ। এইবার তোমার যথার্থ পরীক্ষা উপস্থিত। আশা করি সীতা দেবী যেমন রামচন্দ্রের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি হইবে।

ভাই অনেক দিন হইতে তোমায় একটা কথা বলিব বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু সাহস হয় না; যদি অভয় দাও ত বলি। কথাটা হচ্চে এই 'তুমি যদি একবার দিন কতকের জন্য এখানে বেড়াতে আস, তাহলে বড়ই সুখী হই।' কথাটা বলা যদিও আমার পক্ষে দুঃসাহসিকের কাজ, কিন্তু তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। অনুরোধ থাকিবে কি? আমি নিশ্চয় বলতে পারি এখানে এলে তুমি সুখী

বই অসুখী হবে না। এখানে প্রকৃতি বড় মহিমাময়ী সৌন্দর্য্যশালিনী চিরযৌবনা। একবার দেখিলে মুগ্ধ হইবে।

আজকাল বিশেষতঃ এখানকার জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। যখন অপরাহ্ণে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ফুল-ভারাবনত কর্ণিকার তরুতল দিয়া, ছায়াচ্ছন্ন তৃণমণ্ডিত হরিৎ ক্ষেত্র দিয়া, অত্যুন্নত পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া ঝিল্লিরব মুখরিত মাঠের উপর মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করি, মনে হয় বুঝি আমার মত সুখী দ্বিতীয় নাই। তা' ছাড়া পাহাড়ের উপর একজন পরমহংস আছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নীরব পার্ব্বত্য-ভূমি সঞ্জীবিত করিয়া যখন বিশুদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে তিনি গীতা পাঠ করেন, তখন বাস্তবিকই আপনা আপনি সমস্ত দেহযন্ত্র শিথিল হইয়া আসে, মনে হয় যেন কোন সুখময় স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়াছি। এখানে সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না। স্নিগ্ধ গম্ভীর দৃশ্যের মধ্যে আমার সর্ব্বদাই আত্মবিস্মৃতি জন্মে, আপনাকে যেন অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশুর মত মনে হয়, জননী প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার সমগ্র স্নেহ সমস্ত প্রীতির উচ্ছ্বসিত ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার বিপুল স্নেহ হস্তের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চান। প্রকৃতির স্নেহ অঙ্কে বসিয়া যখন আমাদের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা, হরিৎ কোমলা জন্মভূমির কথা মনে হয় তখন একটু কৌতুকপূর্ণ বিশেষ সুখানুভব করি। গয়া যথার্থই মোক্ষধাম, এইখানেই স্বর্গরাজ্যের সোপান। তা'ছাড়া এখানে দেবাদিদেব গঙ্গাধরের চরণপদ্ম বিরাজিত, ভক্তের অমূল্য ধন সাধকের সাধন দ্রব্য দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিবে।

আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী (শ্রীমতী প্রভা) আজ মাস 'খানেক হ'ল এখানে এসেছে। আজকাল তার পূর্ব্বের বিদ্রোহীভাব নাই, এখন বেশ শিষ্ট শান্ত হয়ে কথাবার্ত্তা শোনে, আর সে রকম দিনরাত প্যান প্যানানি সইতে হয় না। তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হবে—সেই এখন আবার উল্টে আমায় অনুযোগ করে এতদিন কেন তাকে আনা হয়নি, আমার শুভাগমন সেখানে কেন হয়নি। দেখ একবার সংসারের বিচিত্রতা! আশা করি তুমি শারীরিক ভাল আছ। চিঠিখানা অত্যন্ত দীর্ঘাকার ধারণ করলে দেখছি যে। মাভৈঃ! এইবার বিদায় নিচ্চি, অকিঞ্চনের অনুরোধটি পূর্ণ হবে কি?

তোমার দেবেন।

ভালই হইল আমিও একটা এমনি সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। এখানে এ রকম একা একা বড়ই অসহ্য বোধ হইতেছিল। সেই দিনই উত্তর লিখিয়া দিলাম। ২৭শে জানুয়ারী তোমার সহিত মিলিত হচ্চি। বাবার কাছেও অনুমতি পাইলাম। একটা ভাবনা ঘুচিয়া গেল। যাবার উৎসাহে দু'দিন খুব শীঘ্রই কাটিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া মনটা অনেকটাই সুস্থ বোধ হইল। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ, নীবিড় অরণ্যাণি অনন্ত প্রসারিত নীলনভোস্তল ভেদ করিয়া দুইদিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ, নিরন্তর প্রকৃতি দেবীকে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা শীর্ণ ও স্বচ্ছ তোয়া গিরিনদী অলসভাবে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শ্যামলধান্য ও তিসিরক্ষেত্রে ছোট ছোট পাহাড়ীদের মেয়েরা মহিষ তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

একজন গ্রামিক হাতের লাঠি ঘুরাইয়া পথ চলিতে চলিতে গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল ;—"যো হোবে সো হো অব, চরণ ন ছোড়ব, ভ্রম্‌সে যে ইত কাল গয়ো সো গয়োহ্যায়।"

চলন্ত গাড়ীর মধ্য হইতে এইটুকুই বুঝিতে পারা গেল। গানটা কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত মনে ছিল। বুঝি সে গানে আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছিল।

গাড়ী যত অগ্রসর হইতেছিল, দুইদিকে প্রকৃতির শোভা ততই মনোরম হইয়া উঠিতেছিল। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে মধ্যে কৃষকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় কুটির। কুটিরগুলি, সুন্দররূপে পরিমার্জ্জিত, ও যেন চিত্রিতবৎ সুন্দর। কৃষকদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৌতুকপূর্ণ নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, একটী দেড় বৎসরের ছোটছেলে তাড়াতাড়ি গাড়ী দেখিতে আসিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ছেলেটী বেশ মোটাসোটা, মুখখানি বড় সুন্দর, তাহাকে দেখিয়া আমার সুধীরকে মনে পড়িল। সেই ছোট ছেলেটীকে কোলে করিয়া আদর করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী তাহাদের ছাড়িয়া কতদূরেই চলিয়া আসিল! আমার সেই সরল কৃষকদের কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

আমার সঙ্গী কতকগুলি মদগর্ব্বিত মাড়ওয়াড়ী ধনী ভিন্ন কেহই ছিল না, তাহারাও নিদ্রাভিভূত। একাকী বড়ই অসহ্য বোধ হইতেছিল, মনে হইতেছিল, বুঝি কোন সুদূর নিষ্ঠুর নিরস রাজ্যে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়া চলিয়াছি! এখানে এমনি করিয়া এক দুই করিয়া দিন গুণিতে গুণিতে নিতান্ত নিঃসহায় জড়ের মত দীর্ঘ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে হইবে। তাই দুর হইতে ষ্টেশনের উজ্জল আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাড়াইয়া দিলাম, দেখিতে দেখিতে ট্রেণ খোলা ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনটী খুব বড়, ফুল পাতা, বড় বড় অক্ষরে ও চিত্রে সুশোভিত পিয়ার্সোপ্, বিজয়া বটিকা, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। ছোট ছোট মোমের পুতুলের মত সাহেবদের ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটী করিতেছিল, একজন ইংরাজ যুবক গাড়ীর দিকে চাহিয়া কুণ্ডলীকৃত চুরটের ধূম উড়াইয়া দিয়া সঙ্গিনী ইংরাজ মহিলাকে কি বলিতেছিল, এবং দু'জনেই খুব হাসিতেছিল। খুব সম্ভব যে এই লেডির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধীয় কোন কৌতুকজনক আলোচনাই চলিতেছিল, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া চারিধারে একখানা পরিচিত মুখ খুঁজিতেছিলাম। বেশী কষ্টও পাইতে হইল না, ঈষৎ একটু ভুঁড়ি, লম্বাদাড়ি, পেণ্টুলান চাপকান ও চস্‌মা বন্ধুবরকে যদিও গোপন করিবার বিলক্ষণ সুবিধাই করিয়াছিল, কিন্তু আমার চক্ষে তাহা পারিল না। যদিও আমার বাল্যবন্ধু সেই রোগা ছিপছিপে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কপাল পর্য্যন্ত বড় বড় চুল দুরন্ত হাসিমাখা ক্রীড়া-প্রবন পনের বৎসরের চঞ্চল বালক নাই; তথাপি তার সেই স্নেহ মাখা হাসিটুকু কালের কঠোর হস্ত কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। আমার সেই দেবুই আজও আছে। আমার মনে হইতেছিল, শুধু একখানা গাম্ভীর্য্যের আবরণে সে আপনাকে ঢাকিতে চাহিতেছিল!

গাড়ী থামিবামাত্র তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। দেবেন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আপন স্থূলদেহ যথাসাধ্য যত্নে টানিয়া আনিতে আনিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধুর স্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলাম। সমস্ত স্নেহ প্রীতি আনন্দ হাস্যরূপে উচ্ছ্বসিত করিয়া দৃঢ়রূপে আমার হাত নাড়াদিয়া বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—"থ্যাঙ্কিউ, শরৎ! সত্য সত্যই আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারছিনে যে সুদূর প্রবাসেও তা হলে তোমার মত বন্ধুর মিলন-সুখ ঘটা সম্ভব হলো! তুমি তবে সত্য সত্যই আমার অনুরোধ রাখলে? অঁ্যা!"

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবেন যথার্থ ই বলিয়াছিল, এখানে শোক-দুঃখ মনোমালিণ্য কিছুই টেঁকিতে পারে না। এ স্থানটা যথার্থ ই মোক্ষধাম, শান্তিরাজ্য, দেবেনের বাসা ইংরাজ টোলার সন্নিকটে। এই স্থানটাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। চারিধারে উন্নত শৃঙ্গ অভ্রভেদী গিরিমালা। দূরে দূরে দুই একখানি সাহেবদের বাংলা। চারিধারে শ্যামল তৃণ মণ্ডিত ক্ষেত্র, প্রকৃতিদেবী সযত্নে স্বহস্তে সমান ভাবে যেন কাটিয়া ছাঁটিয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছেন। প্রশস্ত সুনির্ম্মিত রাস্তার দুইধারে বিশাল বট, অশোক, ও আম্র বৃক্ষের সারি, রৌদ্রতপ্ত পাথককে শান্তি দিবার জন্য আপনার উদার বাহু বাড়াইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কর্ণিকার তরু সুবর্ণ ফুলভারে নত হইয়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। এখানের সেই সুখময় শান্তিময় স্নেহরাজ্যে আসিয়া অনেক দিনের পর আপনাকে বড়ই সুখী বড় নিশ্চিন্তই বোধ হইল। কিন্তু এই পুণ্যভূমে, এই স্নেহ-রাজ্যে আসিয়াও কি সুভাকে ভুলিয়াছিলাম ; না, এক দিনের জন্যও না। কিন্তু কেন জানি না, এখানে আসিয়া সর্ব্বদা দেব দর্শন ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির অবারিত স্নেহামৃতে সিঞ্চিত হইয়া দিন দিন সুভার স্মৃতি যেন দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে ছিল। সুভার স্মৃতিতে ও সুখ আছে, তাই তার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটী পর্য্যন্ত মনে করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করি, আজকাল সুভার মূর্ত্তি যেন সময় সময় বড়ই অস্পষ্ট মনে হয়।

পাহাড়ের উপর দুই দিন একটী যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, ক্ষুদ্র কুটিরের ভিতর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া যোগীবর যোগমগ্ন। যোগীকে দেখিলে যথার্থই মনে ভক্তির উদয় হয়, আপনা হইতে মস্তক

নত হইয়া পড়ে। দুই দিনই যোগীর সহিত কথাবার্ত্তা হইল না, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ তো আর করিবার সাহস হয় না! যোগীকে কেহ গিয়া আহার করাইয়া আসিলে সন্ধ্যার পর ফলমূল আহার করেন, নচেৎ অনাহারেই কাটিয়া যায়, অনেক বড়লোক সপুত্র, সভৃত্য নানা প্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন লইয়া যোগী দর্শনে গিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপর হইতে সহরের সর্ব্বত্র দৃষ্টি গোচর হয়। সহরটী নেহাৎ সামান্য নয়। এখানে অনেক লোকের বসতি। চারিধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধুনিক ও পুরাতন নির্ম্মিত অট্টালিকার শ্রেণী। কোনখানে প্রশস্ত রাজপথ-উদ্যান, কোথাও গলি ও ঘুঁজি, কিছুরই অভাব নাই। কাছারি বাড়ী খুব বড়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, কোন সুদক্ষ চিত্রকর সযত্নে অট্টালিকা শ্রেণী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই কোলাহল বিহীন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সহরের প্রকৃত অবস্থা মানুষ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। এখানে জমিদার বাবুর একটী বাড়ী বড়ই মনোরম, চারিধারে পুষ্পোদ্যান দীর্ঘিকা ও পশু বাটিকা, মধ্যে শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাড়ীটী দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শুনিলাম এখানে ইংরাজ ভাড়াটিয়া আছে, অগত্যা মনের ইচ্ছা মনে মনেই রাখিতে বাধ্য হইলাম। গয়ায় দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। কিন্তু আমার সহরের চেয়ে এই নির্জ্জন ভূমিই ভাল লাগে।

আজ প্রায় দুই মাস হইল এখানে আসিয়াছি, বড় সুখেই এই দুই মাস কাটিয়াছে। প্রকৃতির স্নেহ অঙ্কে, প্রিয়বন্ধু দেবেনের অকৃত্রিম আদর যত্নে ও বন্ধুপত্নী প্রভার সরল ও সস্নেহ ব্যবহারে হৃদয়ের অন্ধকার দিন দিন অপসারিত হইতেছিল। মধ্যাহ্নের আহারাদির পর বাহিরের দালানে একখানা আরাম চেয়ারে বসিয়া একখানা সংবাদ পত্র উল্টাইতে ছিলাম,

মনটা কিন্তু আদৌ সেদিকে ছিল না। দূরে বায়ু প্রবাহে কম্পিত ঝাউ গাছ হইতে মর্ম্মর শব্দ উত্থিত হইয়া রৌদ্র ক্লিষ্টা ব্যথিতা প্রকৃতির দীর্ঘ শ্বাসের মত শুনাইতেছিল। নিকটে এক খানা টুলের উপর বসিয়া চস্‌মাহীন চক্ষুর সঙ্কুচিত দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করিয়া বন্ধুবর গাহিতে ছিলেন।

'যখন যেখানে থাকি নাথ হে আমি তোমার।'

সেই মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতায়, বায়ু প্রবাহে কম্পিত ঝাউগাছ মর্ম্মর শব্দের সহিত মিশিয়া দেবেনের নিস্তব্ধ তাল-লয় সংযুক্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর বড়ই মিষ্ট শুনাইতেছিল। আমি নীরবে সুমধুর সঙ্গীত রসে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, গানটী দুই তিনবার করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বন্ধু নীরব হইলেন, এবং অন্যমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম 'কি হল, থামলে যে! আকাশে দেখ্‌চ কি?'

দেবেন মাথা চুল্‌কাইয়া, একটু যেন চিন্তিতভাবে বলিল—"তাইত! ভাব ছিলুম কি—'টেলিগ্রাফের খপরটা কি তোমায় দিয়েচি'!"

আমি আশ্চর্য্যভাবে বলিলাম "টেলিগ্রাফ! কার? কোথা থেকে এলো?"

দেবেন একটু ব্যস্তভাবে বলিল,—"তাইত! তবেত বড্ডই ভুল হয়ে গ্যাছে! তোমার বাবা যে এক টেলিগ্রাফ করেছেন, তার মর্ম্ম হচ্চে এই যে যত শীঘ্র পার তোমায় যাইতে হইবে।"

এরূপ জোর তাগিদের মর্ম্ম বুঝিতে পারা গেল না। বড় ভাবনা হইল, সেই সঙ্গে দেবেনের উপর বড় রাগও হইল, বলিলাম,—"আচ্ছা লোকত তুমি! সকালে টেলিগ্রাফ পেয়েচ, আর মোটেই আমায় খপর দাওনি!"

আসনশুদ্ধ স্থূলদেহ হাস্যোচ্ছ্বাসে কম্পিত করিয়া বন্ধুবর বলিলেন,—"তাইত হে ব্যাপারটা কি বল দেখি, এবার কি ভোজের আয়োজন নাকি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালকের মেলে যাওয়াই স্থির হইল।

সন্ধ্যার সময় দেবেনের সাগ্রহ অনুরোধে বেড়াইতে বাহির হইলাম। নির্ম্মল ফল্গুতটে শ্যামল তৃণ ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আজ মন বড়ই খারাপ হইয়াছিল। এই শান্তিময় সুখময় স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া আবার সেই কর্ম্মক্ষেত্রে কঠোর নিরস সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। এখানের প্রত্যেক.বৃক্ষ-লতাটী পর্য্যন্ত যেন এই কয় মাসে আমার অত্যন্ত স্নেহের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ভাবি বিরহ স্মরণ করিয়া মনে মনে কেমন একটা অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। এখনও আকাশে চাঁদ উঠে নাই, নক্ষত্রের স্তিমিতালোক নদীবক্ষে ছায়া বিস্তার করিতেছিল। সম্মুখে সাক্ষীবট বিশালদেহ দীর্ঘজটাজুট ছড়াইয়া উন্নত শীর্ষে আপনার গৌরব বিস্তার করিতেছিল। অন্তঃসলিলা নদী নীরবে বহিতেছিল, জলের শব্দ নাই, নদীর তরঙ্গ নাই স্রোতের আবেগ নাই, স্থিরা ধীরা গাম্ভীর্য্যময়ী, নদী নীরবে নিঃশব্দে বহিতেছিল। কি সুন্দর দৃশ্য! নবীন তৃণ ক্ষেত্রে বসিয়া আপনার বিপুল-দেহের ভার বৃক্ষের গুঁড়িতে ন্যস্ত করিয়া দিয়া কুঞ্চিত নেত্রে ফল্গুর দিকে চাহিয়া দেবেন গাহিতে লাগিল—

‘কাঁদিতে জান না তুমি, কাঁদাইতে জান কেবল!
সুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল,
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলা ফেলা,
সার হয় শুধু সখী!—নয়নের জল।”

নীরব নৈশ গগন কম্পিত করিয়া সুকণ্ঠ দেবেনের গীতধ্বনি, আমার হৃদয় সাগর উচ্ছ্বসিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। আপনার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে কাহার কথা মনে জাগিয়া উঠিল, কাহার সুন্দর মুখ মনে পড়িয়া গেল, তাও কি বলিয়া দিতে হইবে?—সে 'সুভা'। কতক্ষণ অন্য মনে ছিলাম জানি না সহসা লজ্জিত হইয়া আপনি চমকিয়া উঠিলাম, এই পুণ্যস্থানে, এই পুণ্য বৃক্ষতলে, গঙ্গাধরের পাদপদ্মের নিকটে বসিয়া কেন তাহার কথা ভাবি? সে আমার কে?

অন্তস্থল ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইল কেহই নয় কেহ নয় সে পরস্ত্রী, তাহার চিন্তাও আমার পক্ষে মহাপাপ। তবে কেন তাহার কথা ভুলিতে পারি না? না না, ভুলিব, সাধ্যমত তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।

যখন মন স্থির করিয়া দেবেনের সঙ্গীতে কর্ণপাত করিলাম, তখন অন্য মনে বন্ধুবর গাহিতেছিলেন—

চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে।
দুর ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর বিষাদের এ তিমির,
আশারও বিজলি রেখা উজলে না এ হৃদয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পূজিনু জনম ধরে,
মর্ম্মভেদি যাতনার আঁখিবারি দিয়ে।
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ, সকলিত বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

চমকিয়া দেবেনের মুখের দিকে চাহিলাম, এটা কি আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি নয়? দেবেন কি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া এ গান গাহে নাই?

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন ও ঘনীভূত হইতেছিল, আকাশে চাঁদ নাই ; নক্ষত্রালোক মেঘাচ্ছাদিত হইয়া ম্লানভাব ধারণ করিয়াছিল ; ভাল করিয়া দেবেনের মুখ দেখিতে পাইলাম না। মৃদুস্বরে ডাকিলাম "দেবেন !"

দেবেন উত্তর দিল না, সম্ভবতঃ শুনিতে পায় নাই। সে আপনার মনেই গাহিতেছিল—

দিয়েছি হৃদয় প্রাণ, সকলইত বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দুই তিন বার করিয়া গাহিয়া গীত শেষ করিল। দূরে দেব মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিতেছিল। জনকোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, বহুক্ষণের পর দেবেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল চল 'রাত হয়ে গেল যে !'

আমিও উঠিলাম, কিন্তু তখনও মনে হইতেছিল, 'দেবেন কেন ও গানটা গাহিল !'

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম আমার বিবাহ। শুনলাম মেয়ের বাপ নাকি খুব বড় মানুষ। সন্তানের মধ্যে দুই মেয়ে, সমস্ত বিষয় সমান ভাবে দুই মেয়েকেই লিখিয়া দিবেন। আপাতঃ দশহাজার টাকা নগদে ও গহনায় দিবেন। মেয়েটাও নাকি সুন্দরী এবং লেখাপড়াও কিছু জানে।

বলা বাহুল্য কথাটা শুনিয়া সুমধুর প্রীতি রসে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। মার কাছে অনেক আপত্তিও জানাইয়াছিলাম। শেষে এও বলিলাম যে না হয় দিন কতক অপেক্ষা করুন। এখন আমি বিবাহ করিতে—

মা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তোমার যেমন ইচ্ছা হয় করতে পার, আমরা এসব বিষয়ে কথা বলবার কে? এখনকার ছেলে সব স্বাধীন-চেতা। নিজের মতে বিয়ে করবে, তা বেশ কর্ত্তাকে গিয়ে সেই কথাই স্পষ্ট বলগে। আমাদের আবার মতামত কি?"

বুঝিলাম মা এবার সত্য সত্যই রাগিয়াছেন, উত্তর দিতে পারিলাম না। বাহিরে আসিতেই ছুটিয়া সুধীর কোলে উঠিল। আধ আধ স্বরে ডাকিল, 'কাকাবাবু!'

অনেক দিনের পর আজ সুধীরের সুধাকণ্ঠ কানে বাজিল। কেমন করিয়া এই সুদীর্ঘ তিন চারি মাস তাহাকে ভুলিয়া ছিলাম, জানি না। আজ সেই কথা মনে করিয়া বড়ই অনুতাপ হইল। তাই সমস্ত স্নেহ সমস্ত প্রীতি ভালবাসা আবেগে সিঞ্চিত করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। আজ অনেক দিনের পর নির্ম্মল আনন্দ

উপভোগ করিলাম, নিষ্ঠুর সংসার আমার মুখ না চাহুক ক্ষতি নাই। আমার সুধীর ত আমায় ভালবাসে।

এ বাড়ীর সকলেই আনন্দোৎফুল্ল, সকলেই সুখী কেবল আমিই বিষণ্ণ, কিন্তু সেজন্য কেহই সহানুভূতি করিল না। সকলের চেয়ে বৌদিদিরই আনন্দ বেশী। সেটা বড়ই অসহ্য! মনোভাব গোপন করিলাম না, এক দিন স্পষ্টই বৌদিদিকে বলিলাম।—"আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের এত সুখ কেন?"

কথাটা প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে বৌদিদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তার মানে কি?"

আমি বলিলাম "এ বিয়ে হলে আমার চির জীবন অশান্তি পূর্ণ হবে, তা কি বোঝ না?"

উপহাসের চাপা ও মৃদু হাসি হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন "আচ্ছা গো আচ্ছা দেখা যাবে তখন শান্তিপূর্ণ হয় কি অশান্তিপূর্ণ হয়! মরছিনে আর এক্ষণি।"

রাগে দুঃখে ক্ষোভে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। হায়রে আমার মর্ম্ম বেদনা এ পৃথিবীতে কি একটী প্রাণীও বুঝিল না? সেই পংক্তিটা মনে পড়িল "এ হৃদয় বুঝিল না কেহ" ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কোন কথাই কহিব না, যা হইবার হউক। আমার এ জীবনটা না হয় গুরুজনদিগের প্রীতির নিমিত্ত আহুতি দিয়াই দিলাম, না হয় ব্যর্থই হইয়া গেল, কি এমন মূল্যবান জীবন রত্ন এ? কোন্ প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে একে তাজা রাখিয়া? যাক্ ভেঙ্গে চুরে গুঁড়াইয়া যাক্।

শেষদান

আজ ফুলশয্যা, ২৪শে ফাল্গুন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ ২৬শে ফাল্গুন। বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেলাম। সুনীল আকাশের ছায়া ভাগীরথীর জলে পড়িয়াছে, উল্লাসে অধীর হইয়া নদী মোহ মন্ত্রে কি জানি কি গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, তটাহত জলের কল্লোলধ্বনি তরঙ্গ ভঙ্গের সমতালে শ্রুত হইতেছিল। দূরে শ্যামল অদূরে শস্য ক্ষেত্র। সারি সারি ঝাউ দেবদারু আম্র বৃক্ষের ছায়া নিবিড় গ্রাম্যপথ সুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে কৃষক-দিগের পর্ণ কুটির হইতে ধূমরেখা নির্গত হইয়া বিসর্পিত গতিতে ঊর্দ্ধ পথে উত্থিত হইতেছিল। গঙ্গার ঘাটে গৃহকার্য্য ব্যপদেশে সমাগতা মহিলাকুলের কলকণ্ঠ ও ভূষণ সিঞ্চন ধ্বনি শান্ত সন্ধ্যাকে সঞ্জীবিত করিতেছিল। কিছুই ভাল লাগিল না। অন্য মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সানায়ে বড় মধুর সুরে বাজিতেছিল—

এল বর দেখলো চেয়ে পরে গলে তারার মালা।
কনে বউ কুমুদিনী আড় নয়নে ঘোমটা খোলা।

উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাষিত, সৌরভময় পুষ্প সজ্জিত শয্যায় বৌদির বাক্যবানে আহত হইয়া আসিয়া বসিলাম। চারিধারে রমণীবৃন্দ আমায় ঘেড়িয়া দাঁড়াইল, সকলেই আজ আনন্দ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমার মুখের ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

বৌদিদি তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি ঠাকুরপো! এখনও যে দেখছি মন ভাল হয়নি।"

একজন নিমন্ত্রিতা রমণী আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "বলিস কি সুধীরের মা! অমন সুন্দর বৌ হলো, ও মুখ দেখেও নাকি আবার কারু মন খারাপ হয়! কেমন ধারা মন গো?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন "ওঁদের কথা বল কেন দিদি! ওঁরা সব কবি মানুষ, আমাদের মতন মুখ্যুত নন, কাজে কাজেই সংসারের উপর রাগ করে শুভদৃষ্টির সময় বউ বেচারীর মুখই দেখেন নি। আর বলেছিলেন বোধ করি কখনও দেখ্‌বেনও না। তাতে আবার ক'নের নাম লক্ষ্মী! রামোঃ! হ'ত ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা, কিম্বা গ্যাসলাইটবালা, তবে না মুখের দিকে চোক তুলে চেয়ে দেখতেও বা ভরসা হতো!"

মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলাম "বৌদি তোমার ছটি পায়ে পড়ি, আজ একটু সকাল সকাল আমায় অব্যাহতি দাও। আমার শরীর একটুও ভাল নেই।"

"ও ঠাকুরঝি! শুনলি ভাই? এখন আমরা যত শীঘ্র যাই ততই ওর ভাল। তা বেশ, বেশ, দেখ ভাই শুভা! আমার ঠাকুরপোটীকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুই ভাই একটু যত্ন টত্ন করে ওর মাথা ধরা টরা ছাড়িয়ে দিস্। কিন্তু খবরদার বলছি! মুখ ওকে দেখাস নে—"

হাসির আভায় উজ্জ্বল মুখে কনে বউয়ের দিকে কটাক্ষ করিয়া বৌদি ত্বরিতহস্তে তার মুখের ঘোমটাটা তুলিয়া ধরিলেন "ঠাকুরপো চেয়ে দেখ না ভাই! তোমার বদলে শুভদৃষ্টি আমিই করেছি, আমিই এই সোনা মুখখানা ভাল করে দেখি।"

তখন সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া সোৎসুক নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম।

কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহা সত্য না স্বপ্ন ? সত্য সত্যই কি সুভাই আমার এই বিবাহিতা পত্নী লক্ষ্মী ! যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই তাহাই কি সত্য হইল ! সুভা আমারই !

সত্যই নাকি ভাই ! সুভার পিতামহ তিনমাস পূর্ব্বে অকস্মাৎ মারা যান। সুভার পিতা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সম্প্রদানের সময় শুনিয়াছিলাম নববধূর নাম লক্ষ্মী। এটী সুভার রাশি নাম।

বাড়ীর সকলেই এ সব খবর জানিলেও বৌদির নিষেধে আমার কাছে কেহই এ কথা প্রকাশ করে নাই। রাগে দুঃখে আমিও আত্মহারা হইয়াছিলাম, বৌদিদি ঠিক বলিয়াছেন আমাদের মত লেখাপড়া শেখা বুদ্ধির চেয়ে তাঁহাদের বুদ্ধি অনেক বড়।

ব্যর্থদান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্যারিষ্টার ভবেন্দ্র রায়ের সুবৃহৎ বাড়ীখানি পথচারী পথিকের চক্ষে এককালে ছবির মতই মনোরম দেখাইত। তাহার শ্রীসম্পদ পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল; কিন্তু এখন আর তাহার সেদিন নাই। কালের নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত শোচনীয়রূপে সেই আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত অতিথি অভ্যাগত-পূর্ণ প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকাখানি যেন এখন পক্ষী-কূজন-হীন পরিত্যক্ত বট বৃক্ষের ন্যায় আপনার বিপুল দেহভার লইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছে। নিদারুণ প্লেগ রোগে ব্যারিষ্টার সাহেবের বৃহৎ পুরী-খানিকে একেবারে জনহীন মরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছে। প্লেগ রাক্ষসের হস্তে রক্ষা পাইয়াছিল কেবল তাঁহার কন্যা মীরা এবং বৃদ্ধা ধাত্রী মতিয়া। অত বড় বাড়ীখানার মধ্যে দুই চারি জন দাসদাসীর সঙ্গে মতিয়াকে অবলম্বন করিয়া মীরার নিরানন্দ দিনগুলি কাটিতেছিল। মীরা সুন্দরী শিক্ষিতা, তাহার উপর পিতৃপরিত্যক্ত অতুল ধনের অধি-কারিণী। এ হেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ সত্ত্বেও সপ্তদশবর্ষীয়া মীরার ভাগ্যে বিবাহ ঘটিল না। এরূপ হইবার কিছু কারণও ছিল। তাহার পিতা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন হইতেই তিনি তাঁহার এক বন্ধুপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ছেলেটীর নাম সতীশচন্দ্র। সম্প্রতি বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া সে বোম্বাইয়ে কাজ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এ সকল সংবাদ

মীরা কিছুই জানিত না। বাল্য-বিবাহ-বিরোধী রায় সাহেব কন্যার নিকট এ খবর গোপন রাখাই উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার উকিল বন্ধু রাধাকিশোরের নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়া যান, "যদি মীরা বাঁচিয়া থাকে এবং সতীশচন্দ্রের চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ না ঘটে, তবে উপযুক্ত বয়সে তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়া যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়।"

আকস্মিক নিদারুণ আঘাতে বালিকা বয়সেই মীরার মনে বৈরাগ্যের ভাব জন্মিয়াছিল। সে কাহারও সহিত বড় সাক্ষাৎ করিত না, আমোদ-উৎসবে কোথাও যোগ দিত না, নিমন্ত্রণের আদান-প্রদান রাখিত না, সংসারে থাকিয়াও সংসারের বাহিরে সে বাস করিতেছিল। অবশ্য তাহার ন্যায় সুন্দরী ঐশ্বর্য্যশালিনীর পক্ষে অনাহূত বন্ধুবান্ধবের অভাব হইত না ; কিন্তু মতিয়ার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুতীব্র রসনা শীঘ্রই তাঁহাদিগকে পরোপকারের সদিচ্ছা হইতে দূরে সরাইয়া দিত। পিতা বর্ত্তমানে তাঁহারই চেষ্টা যত্নে শিক্ষা দীক্ষা মন্দ ঘটে নাই। এখন কোন কাজ বা কোন বন্ধনই যেন তাহার নাই। শিল্পকার্য্য প্রভৃতি তাহার ভাল লাগে না ; কাহার জন্যই বা লাগিবে! লোকে এ সব কাজ করে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের, স্নেহের পাত্রদেরই জন্য। সে কাহার জন্য করিবে? সময় সময় বাড়ীর বেহারা, মালী বা দাস-দাসীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক পরিশ্রমে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী বিলাইয়া দিত। পাখী, পায়রা আর পিতার লাইব্রেরী ঘরের পুস্তক রাশি তাহার সঙ্গী—তাহার স্নেহ-পাত্র—তাহার নিরানন্দ একঘেয়ে দিন যাপনের অবলম্বন ; কিন্তু এ সবও তাহার আর বড় ভাল লাগিতে ছিল না। অসম বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী নয়।

রাধাকিশোর মধ্যে মধ্যে আসিয়া বন্ধু-কন্যার সংবাদ লইয়া যাইতেন ; বিষয়-আশয় তিনিই দেখেন। মীরা তাঁহাকে জেঠামহাশয় বলিয়া ডাকে। এই একটী মাত্র লোককে তাহারা বন্ধু বলিয়া মনে করিত ; বিশ্বাস করিয়া সাহায্য লইত। তিনিও মীরাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। মীরার বয়স সতের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, একদিন রাধাকিশোর তাহার সহিত কথোপকথনের মধ্যে বলিলেন "এইবার মীরা-মার বিবাহ হওয়া উচিত।" মতিয়া সন্দেহের চক্ষুতে একবার প্রবীণ ব্যবহারজীবীর আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "আমার মীরা-মায়ের যোগ্য বর কোথায় মিলিবে উকীল সাহেব?" বৃদ্ধ হাসিলেন—কহিলেন, "সে কথা সত্য—তবু যিনি গৌরী গড়িয়াছেন তিনি শিব গড়িতেও ভুল করেন নাই বুড়ী—খুঁজিলে মিলিবে বৈ কি।" এই পৌরাণিকী উপমা মীরার মনঃপূত হইল না ; সে হাসিয়া কহিল, "শিব বুড়া—আমি বিবাহ করিব না—আইবুড়াই থাকিব—জেঠামহাশয় আমার বিবাহ দিও না। রাধাকিশোর সস্নেহ নেত্রে বন্ধুকন্যার সারল্য-পূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বাবা তোমার জন্য পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ আদেশ পালনে তুমি যে বাধ্য মা, ডাক্তার সতীশ বোস তোমার ভাবী স্বামী ; এ আমার কথা নয়, তোমার স্বর্গীয় পিতার আদেশ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধাকিশোরের মুখে এই সংবাদ পাইবার পর এই সর্ব্বপ্রথম মীরার মনে পড়িল তাহারও একটা ভবিষ্যৎ জীবন আছে। আজ সহসা নিজেকে তাহার আর বালিকা বলিয়া মনে হইল না। বয়সেও যেন সে হঠাৎ অনেকখানি বাড়িয়া উঠিল। কোথা হইতে যেন একটা লজ্জাও মনের মধ্যে দেখা দিল। জেঠামহাশয় বলিয়াছেন সতীশ ডাক্তারের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। কে জানে তিনি কেমন প্রকৃতির লোক, তাহার সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন, দেখিতে কিরূপ, এমনই সব চিন্তা অকস্মাৎ তাহার চিত্তে উদিত হইয়া তাহাকে একটু চঞ্চল করিয়াও তুলিতে ছাড়ে নাই। দুই একবার মনে হইল বিবাহ না হইয়া এমনই ভাবে দিন কাটাইতে পারিলেই বুঝি ভাল ছিল। কে জানে, তিনি কেমন, কে জানে সে বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারিবে কি না?

পিতার আমল হইতেই মীরা তাঁহার সহিত সমুদ্রের ধারে সান্ধ্য-ভ্রমণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল। কখন গাড়ীতে, কখনও পায়ে হাঁটিয়া মতিয়ার সহিত সে এখন পর্য্যন্ত সমুদ্রের কোন নির্জ্জন তীরেই প্রায়ই বেড়াইতে যাইত। সে দিন মতিয়াকে লইয়া মীরা যখন সমুদ্র-তীরে পৌঁছিল, তথন আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। শরতের গোধূলি, সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা সুদূর আকাশের শেষপ্রান্তে তখনও মিলাইয়া যায় নাই। মীরা একখানা উপন্যাস হাতে করিয়া আসিয়াছিল। বই মুড়িয়া সে একদৃষ্টিতে সাগরবক্ষে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সেই সীমাহারা অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের পানে অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া

আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সাগর-বক্ষে লোহিত আলোকের ঢেউ তুলিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ বেলাভূমে আছাড়িয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অনন্ত জল-রাশির অচঞ্চল নীলিমা ঘুচিয়া গিয়া একখানা মেটে পাথরের অচঞ্চল কৃষ্ণাভা ফুটিয়া উঠিল। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘে সারা আকাশ ভরিয়া উঠিল—বাতাসটাও জোরে বহিতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রের জল যেন পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফীত হইয়া উঠিল। মতিয়া বলিল, "মীরা ঘরে চল—বুঝি বৃষ্টি আসিল।" মীরা উঠিল না, সে মুগ্ধনেত্রে আকাশ পানে চাহিয়াছিল। পালতোলা নৌকার মত খণ্ড মেঘগুলা ক্রমেই বড় হইয়া আকাশের গায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাতাসে সমুদ্র তীরের বালু উড়িয়া চোখে মুখে ছিটা-গুলির ন্যায় বিঁধিতেছিল, অগত্যা মতিয়ার বহু আহ্বানে মীরাকে ঘরে ফিরিবার জন্য উঠিতে হইল। তখন বাতাসের বেগ বাড়িয়াছে। পথে চলা দায় হইল। বালুকা উড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সমুদ্রতীর ছাড়িয়া তাহারা যখন পথে আসিয়া পৌঁছিল তখন বৃষ্টি নামিয়াছে। নিকটে এমন কোন লোকালয় নাই যেখানে আশ্রয় মিলে। গাড়ী সে ফিরাইয়া দিয়াছে। মতিয়া মীরার জন্য ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ী ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ভৎ‌সনাও করিতেছিল। মীরা কেবল হাসিতেছিল, এমন সুযোগ ত আর সর্ব্বদা মিলে না; তাই মতিয়ার রাগে তাহার হাসির মাত্রা বাড়িয়াই উঠিতেছিল। নিজেদের লইয়া তাহারা যখন বিব্রত সহসা তখন নিকটে তাহারা মানব-কণ্ঠের স্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের পরিচিত মূর্ত্তি নূতন প্রতিবেশী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেন অত্যন্ত

ভদ্রভাবে নিজের ছাতাটা মীরাকে দিতে চাহিতেছেন, ছাতা একটা, মীরা লইলে তাঁহাকে ভিজিতে হয়। সে সম্মত হইল না—কহিল, "আমার কাপড় ত ভিজিয়াই গিয়াছে, আপনি কেন অকারণে ভিজিবেন?" কিন্তু মতিয়া সহজেই রাজি হইল। সে ছাতা গ্রহণ করিয়া সাহেবের উদারতার যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে দিতেই মিঃ সেন দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। মীরা আপত্তি প্রকাশের আর অবসরই পাইল না। সে তখন মতিয়াকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বুড়ি হাসিয়া কহিল, "তাতে আর হয়েছে কি? ওনারা পুরুষ মানুষ ছুটে চলে যেতে পারবেন। তা বলে তোর কি ভিজিলে সইবে?" তর্কে তাহার ভ্রম বুঝান অসম্ভব বুঝিয়া অগত্যা মীরা চুপ করিল। কিন্তু সে রাত্রের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ন্যায় তাহার এলোমেলো চিন্তারও কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাত্রে ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন তাহার উপকারক বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বরে পড়িয়াছেন!

ওই যুবাটিকে সে তাহার ঘরের জানালা হইতে সম্মুখের বাসাবাড়ীতে প্রায়ই দেখিতে পায়। কিন্তু কখন তাঁহার সহিত চোখে চোখে মিলে নাই। তাই সে ইহাঁর অনন্যসাধারণ ভদ্রতায় অত্যন্ত বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিতই হইয়াছিল।

বেলা আটটার সময় হিমাংশু সেনের আগমন সংবাদ পাইয়া মীরা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত নীচে নামিয়া আসিল। কোন ভদ্রলোকের সহিত এ ভাবে সে কখনও সাক্ষাৎ করে না। ইনি নূতন লোক এসব খবর হয় ত জানেন না। ঘরে ঢুকিতেই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাসিমুখে মীরার পূর্ব্বদিনের পঠিত উপন্যাসখানা বাড়াইয়া

দিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন; বিরক্ত করলাম—আপনি কাল বেড়াতে গিয়ে এখানা বোধ হয় ফেলে এসেছিলেন।" বইখানার কথা মীরার মনেও ছিল না। সে লজ্জিত ভাবে বই লইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল। তারপর কহিল, "আপনি কি করে জানলেন ওখানা আমার বই?" বৃষ্টিতে ভিজিয়া বইখানার দুরবস্থার অন্ত ছিল না। তবু তাহাতে নাম লেখা যে ছিল না সে কথা মীরার বেশ স্মরণ ছিল। একটু খানি সলজ্জ মৃদু হাসি হাসিয়া ইতস্ততঃ করিয়া হিমাংশু বলিল, "সেদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ওখানা আপনাকে যেন পড়তে দেখেছিলাম মনে হলো।"

মীরা বিস্মিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জিতও হইল, কারণ সে ভাবিল তবে ত অনেক সময় সে তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে? বিরক্ত হইবার কারণ থাকিলেও জানি না কেন তাহার মনে বিরক্তি আসিল না। একটু হাসিয়া বলিল,—"বইখানা আমারই বটে।"

ইহার পর আরও অনেকদিন হিমাংশুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহে নাই। যেদিন তিনি তাঁহার বসিবার ঘরে না থাকিতেন বা জানালা বন্ধ থাকিত, মীরা কারণে-অকারণে অনেকবার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত। অথচ জানালা খোলা থাকিলে সাধ্যমত সে এদিকে আসিত না, পাছে তাঁহার চোখে পড়ে তাই সাবধানে সরিয়া থাকিত। অপর কেহ হইলে হয় ত মীরার সহিত আলাপের যে সহজ সুযোগটুকু ঘটিয়াছিল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যাতায়াতে ক্ষান্ত থাকিত না। কিন্তু কেন কে জানে হিমাংশু তাহা করিল না। করিল না বলিয়াই মীরা তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে সুরু করিল। এই অল্পদিনের পরিচিত যুবকটীর ভিতর

এমন একটা অসঙ্কোচ সরলতা ছিল, যাহাতে তাহাকে সহজেই আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। অথচ তাহার তরফ হইতে এ সম্বন্ধে এতটুকুও উদ্যম দেখা যাইত না। মীরা আপনার মনের কথা জানিতে না পারিলেও আর একজন তাহাকে অধীত পুস্তকের পৃষ্ঠার মতই অধ্যয়ন করিতেছিল। সে মতিয়া। ইতিমধ্যে মীরার পিতৃনির্ব্বাচিত ভাবী-স্বামী ডাক্তার সতীশচন্দ্র দুই চারিবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; মীরা দুই চারি মিনিট দেখা করিয়াই তাঁহাকে বিদায় দিয়াছে। অসুখের ভাণ করিয়া দুই একবার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই। এই সব দেখিয়া মতিয়া প্রমাদ গণিল। ডাক্তার সুরূপ নহেন, তাঁহার স্বভাবটাও একটু রূক্ষ; লোকে বলে তিনি নাকি বিলক্ষণই মাতাল। মীরা হাসিয়া ঠাট্টা করিলে মতিয়া রাগ করিত, বলিত, "ছিঃ মীরা! যিনি দুদিন পরে তোমার স্বামী হইবেন তিনি ঠাট্টা তামাসার যোগ্য নন, তাঁকে ভক্তি করা উচিত।"

মীরা হাসিয়া লুটাইত।

"ফুল তুলসীপাতা যোগাড় করে রেখে আয়, এবার এলে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করব।"

মীরা হাসিত, মতিয়া দেখিত হাসির তলে বেদনার অশ্রু নিশির পত্রাগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর ন্যায় টল টল করিতেছে। মতিয়া বুঝিত সর্ব্বজয়ী প্রেমের পদে বালিকা নিজের কর্ত্তব্য বলিদান দিবে না। পিতার ইচ্ছাই সে পালন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছে। বুঝিয়া বাহিরে আসিয়া স্নেহময়ীবৃদ্ধা অশ্রুমোচন করিত।

একদিন রাধাকিশোর মীরাকে দেখিতে আসিলে মতিয়া তাঁহাকে

নির্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল "উকীল সাহেব, আমাদের এই ম্যাজিষ্টর হিমবাবু লোক কেমন বলুন দেখি ?" তাহার স্বরে যে গোপন অর্থ লুক্কায়িত ছিল বিচক্ষণ বহুদর্শী রাধাকিশোরের নিকট তাহা গোপন রহিল না ; তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "লোক চমৎকার—যেমন সদাশয় সচ্চরিত্র তেমনি নিরহঙ্কার।"

মতিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া অপেক্ষাকৃত স্বর নামাইয়া কহিল, "আমাদের মীরা মায়ের সঙ্গে এনার বিয়ে হলে সব চেয়ে মানাত ; হরগৌরী মিলন হোত—তা হয় না।"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "না তা হয় না—স্বর্গীয় রায় সাহেব আদেশ করেছিলেন ছেলেটীর বিশেষ কোন চরিত্র দোষ না ঘট্‌লে ওকেই যেন তাঁহার জামাতা করা হয়। ডাক্তার সুতীশ বোসের কোন অপরাধ নাই।"

মতিয়া হাল ছাড়িল না, কহিল, "কর্ত্তামশায় ত জান্‌তেন না ডাক্তার সাহেব মাতাল হয়ে বিলেত থেকে আস্‌বে।"

বৃদ্ধ বাধা দিয়া কহিলেন, "ওটা এখন সভ্যতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; মদ খেলেই কিছু মাতাল হয় না।"

বুড়ীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হিমাংশুবাবু সেদিন আমার ওখানে গিছ্‌লেন—আমাকে মীরার অবিভাবক জেনে এই কথাই তুলেছিলেন।"

মতিয়া কোটরগত বিস্মিত চক্ষুর দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তারপর আপনি কি উত্তর দিলেন তাঁকে।"

"যা সত্য আমি বল্‌লাম, ডাক্তার বোসের সঙ্গে ওঁর বিয়ের সম্বন্ধ স্বর্গীয়

রায়সাহেব নিজে স্থির করে গিয়েছেন। মীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় তাকেও সে কথা সম্প্রতি জানান হয়েছে।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মতিয়া কহিল, "তিনি কি শুনে বড় দুঃখিত হলেন?"

"তিনি ভদ্রলোক এ কথার পর ক্ষমা চেয়ে চলে গেলেন, বল্‌লেন যোগ্য হাতেই দেওয়া হ'চ্চে। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনি মীরাকে ভালবাসেন। আমার কথায় তিনি যে দুঃখিত হ'য়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নাই।"

মতিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, "সুরযদেব করুন মীরা মা যেন যোগ্য হাতেই পড়ে। কিন্তু বিয়েটা একটু শীঘ্র হ'লেই ভাল হয়।"

রাধাকিশোর বলিলেন, "ডাক্তারের ইচ্ছা শুভকর্ম্ম মাঘ মাসেই সম্পন্ন হয়, তুমি মীরার কাছে একথা জানাইও।"

শুষ্ক পত্রে মৃদু পদশব্দের মর্ম্মর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে"?

উত্তর না পাইয়া রাধাকিশোর বলিলেন, "কাঠ বিড়ালী হইবে, চল, মীরা বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের খুঁজিতেছে।"

উপরে পাঠাগারে গিয়া উভয়ে দেখিলেন, মীরা তখন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরে কি দেখিতেছিল। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিলে মৃদু হাসিয়া মীরা অগ্রসর হইয়া রাধাকিশোরকে প্রণাম করিল; কতক্ষণ আসিয়াছেন, কোথায় ছিলেন ইত্যাদি বলিয়া অন্য দিনের ন্যায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিল না। মতিয়ার মনে হইল তাহার হাসির মধ্যে বিষাদের সুর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। সে যেন তাহার চোখের কোণে জলের রেখা দেখিল। এটা কি তাহারই নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টির ভ্রম?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মতিয়ার শরীর অসুস্থ থাকায়, সেদিন বৈকালে মীরা একাই গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে ঘোড়ার পায়ে চোট লাগায় ঘোড়াটা বসিয়াছিল। বাহিরের ঘা শুকাইলেও ভিতরে ভিতরে বেদনা ছিল। ফিরিবার সময় ঘোড়াটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া ক্রমাগতই দাঁড়াইতে চাহিতেছিল; কোচম্যানও ছাড়িবে না, সেও চলিবে না—মীরা কহিল, "ঘোড়া দুষ্টামি করিতেছে আমি না হয় নামিয়া যাই।" করিমবক্স নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য সে কথা কানে তুলিল না; বার কয়েক চাবুক খাইয়াই ঘোড়াটা এমনই ছুটিতে আরম্ভ করিল যে, তখন আর তাহাকে রাশ টানিয়া সংযত রাখা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঘোড়াটা খানিক ছুটিয়া হঠাৎ একেবারে বাঁকিয়া একটা নর্দ্দমার পাশে গাড়ীখানা কাত করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া রাশ ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কোচম্যান দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া মাথায় এরূপ ঘোরতর আঘাত পাইয়াছিল যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল; ঘটনাটা ঘটিতে কিন্তু দুই মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই।

মীরা ভয়ে জ্ঞান হারাইয়াছিল। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল, সম্পূর্ণ অপরিচিত শয্যায় সে শয়ন করিয়া আছে। উঠিতে গিয়া গাত্র বেদনায় সব কথা স্মরণ হইল। কেবল কেমন করিয়া এখানে আসিল সেইটুকুই স্মরণ হইল না। এমন সময় দ্বার খুলিয়া হিমাংশু-নাথকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্ময়ে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

মীরাকে উঠিতে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হিমাংশু বলিলেন, 'এই যে আপনি উঠ্তে পেরেছেন; আমার ভারী ভয় হয়েছিল। ডাক্তার সাহেবকে খবর দিয়েছি তিনি এলেন বলে"।

ডাক্তারের নাম শুনিয়া মীরা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"তাঁর কোন দরকার নেই, আমি বেশ ভাল আছি।"

তারপর বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইয়া সলজ্জ-হাস্যে মুখ নত করিয়া বলিল, "খুব ভোগালুম আপনাকে।"

হিমাংশু স্মিতহাস্যে কহিল, "কিচ্ছু না। আমি কাছারী থেকে বাড়ী ফির্চি পথে দেখি এই ব্যাপার, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য অথচ গাড়ীর ভিতর যে কেউ আছেন তাঁকে বার করা প্রয়োজন এ কথা কারও খেয়ালই হয় নি; ভগবান খুব রক্ষা করেছেন তাই আঘাত তেমন পান্ নি; বোধ করি ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির সহিত সুগভীর স্নেহ ব্যক্ত হইতেছিল!

মীরা কহিল, "আমি তবে এইবার বাড়ী যাই এই কাছেই ত বাড়ী!"

"না না তা কি হয়, ডাক্তার এখুনি আসবেন; তাঁর মত না নিয়ে যেতে দিতে পারি না।"

হিমাংশুর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু এমন সময় মীরার চোখে বিরক্তি ও বিষন্ন ভাব এমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল যে, হিমাংশু তাহাতে বিস্মিত হইলেন। হয় ত নিজের ব্যবহারে অধিকতর স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, পরে বলিলেন, "ইচ্ছে করেন ত তাঁকে আপনার ওখানেই নিয়ে যাব; আমার কিন্তু মনে হয়েছিল তাঁর মত নিয়ে গেলেই ভাল হয়।"

মীরাও নিজের অসৌজন্য প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জায় তৎক্ষণাৎ সহজ ভাবেই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ডাক্তারের কিছু দরকার নেই, আপনারা আমাদের কি যে ভাবেন তা বলিতে পারি না—আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

মীরাকে হাসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া হিমাংশু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "আপনার বুড়ী দাই ত কেঁদে হাট বসিয়ে দিয়েছে, তাকে আমি বাইরে বসিয়ে রেখে এসেচি, ডেকে আনি।"

ডাক্তারের আগমন-সম্ভাবনার আশঙ্কায় মীরা প্রতি মূহুর্ত্তে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল; কারণ সকল কথা ত সে খুলিয়া বলিতে পারে না।

মন্তিয়াকে সঙ্গে লইয়া হিমাংশু সে কক্ষে প্রবেশ করিলে বুড়ী মীরাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াই আকুল হইল। মীরা হাসিয়া তাহাকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে গিয়া, নিজের চোখের জল সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল সে কথা কাহারও স্মরণ ছিল না। হিমাংশু তখন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ভৃত্য মাণিক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই; মীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণের পর তাহার মনের বোঝা যেন কতকটা নামিয়া গিয়া মনটাকে হালকা করিয়া দিল। সে এতক্ষণ মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল যেন ডাক্তার বাড়ীতে না থাকে। পরে মীরা তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলে, হিমাংশু গাড়ী তৈয়ারী করিতে আদেশ দিলেন। মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই হুপা চল্‌বার জন্যে গাড়ী! কি যে বলেন আপনি; না আমি হেঁটেই যাব।"

তাঁহার আপত্তি টিকিবে না বুঝিয়া হিমাংশু আর প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাটীর গেটের ধার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার দীর্ঘদেহ তরুচ্ছায়া-ঘেরা পথের শেষপ্রান্তে মিলাইয়া গেলেও, মীরা কতক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাগানে মালীরা তখন কেহ ফুলগাছে জল ঢালিতেছিল, কেহ গোলাপ গাছের শুষ্ক ফুলগুলা ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল—কেহ বা পাতা-বাহার গাছ গুলার বর্দ্ধিত অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া সুদৃশ্য করিতেছিল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। গেটের ধারের কোন পুষ্পিত লতার সদ্যফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই বসন্তের উতলা বাতাসের মত মীরার মনটাও যেন উদাসভরে কোথায় উড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল। "মীরা বাড়ী চল তাঁকে আর দেখা যাচ্চে না" মতিয়ার এই মৃদু স্নেহসূচক সম্বোধনে সচকিত হইয়া মীরা অগ্রসর হইল। তাহার গমনকালের চাপা নিশ্বাসটি মতিয়ার কর্ণে কিন্তু চাপা রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্নানের পর পিঠের উপর ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া দক্ষিণের খোলা বারান্দায় রোদে বসিয়া মীরা একখানা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। গল্পের শেষ অংশটা খুব জমিয়া আসিয়াছে, নায়িকা হিরণ্ময়ীর পুনঃ পুনঃ বিপদ এবং অভূতপূর্ব্ব উপায়ে উদ্ধার-লাভে সহানুভূতিতে তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া উঠিতেছিল। নীচে বারান্দার সম্মুখে রান্নাঘরের রকে বসিয়া মতিয়া কচুরীর জন্য কড়াইসুঁটি ছাড়াইতে ছাড়াইতে গৃহমধ্যস্থা রন্ধননিরতা পাচিকার সহিত গল্প করিতেছিল। এমন সময় ভৃত্য মদন বাজার হইতে ফিরিয়া তরকারীর ঝুড়ি রকে নামাইয়া মৎস্যের পাত্রটা উঠানে রাখিতে রাখিতে বলিল, "আহা সাহেব বিঘোরে মারা গেল।"

মদনের মন্তব্যে উভয়ের গল্পের স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল, দুজনেই উৎসুক-কণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে সাহেব রে মদন!"

মদন বাজারের ঝুড়ি উজাড় করিয়া বাজারে অগ্নিদাহ হইয়া দ্রব্য সকল যে কিরূপ মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানকার দ্রব্যে হস্তস্পর্শ করা যে কতদূর অসমসাহসিকতার কার্য্য, তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া, পরে বলিল, "এই ম্যাজিষ্টর সাহেব গো, এই যে আমাদের নগিচেই বাসা।"

উপরে পাঠ-নিরতা মীরার কর্ণেও কথাগুলা প্রবেশ করিয়াছিল। সহসা তাড়িত-স্পৃষ্টের ন্যায় হাতের বই ফেলিয়া সে চমকিয়া ধড়ফড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "কি হয়েচে রে মদন, কি হয়েছিল তাঁর?"

উদ্বেগে তাহার কণ্ঠ ও দেহ কাঁপিতেছিল।

মদন কহিল "না সাহেব এখনও মারা যায় নি, তবে যাবে। ভারী ব্যারাম তাঁর।"

মতিয়া মীরার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মতিয়া ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহা এই ; সাহেবের ব্যায়রাম সত্যই কঠিন। আরাম হওয়া সে এখন ভগবানের হাত, পেটের ভিতর কি হয়েছে। তাঁহার আত্মীয়দের সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আর তেমন নিকট আত্মীয়ও কেহ নাই! যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অমতে বিলাত যাওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্য সাহেবের ইচ্ছা নয় তাঁহাদের সংবাদ দিয়া ত্যক্ত করা। অবশ্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা দেখা শুনা করিতেছেন। ডাক্তার সতীশচন্দ্রই তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। অন্যান্য ডাক্তারও সঙ্গে থাকেন, তবে কর্ণধার-হীন নৌকার ন্যায় আত্মীয়-হীন সংসারে রোগীর সেবা-যত্নের তেমন শৃঙ্খলা নাই; অনেকগুলা চাকর-বাকরের হাতে পড়িয়া গোলযোগে অর্দ্ধেক ঔষধ সেবন করাই হয় না ; পথ্যের অবস্থাও অনেকটা সেই প্রকার, কারণ তাহারা নূতন লোক—প্রয়োজন এবং রুচি বুঝিয়া চলিতে পারে না।

সেদিন দুপুর বেলা মতিয়াকে সঙ্গে লইয়া মীরা হিমাংশুনাথকে দেখিতে গেল। রোগীর কক্ষে তখন অধিক লোক ছিল না। সকলেই নিজের কাজে গিয়াছে। বাহিরে রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় চাকরগুলা এক স্থানে জটলা পাকাইয়া মৃদুস্বরে কি সব আলোচনা করিতেছিল, মতিয়া সংবাদ পাঠাইতে বলিলে, একজন উঠিয়া খবর দিতে গেল।

চোখে আলো লাগিবার ভয়ে খড়খড়িগুলা বন্ধ। ঘরে ঢুকিয়া

প্রথমটা মীরা কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল পরিচিত কোমল-কণ্ঠে তেমনই স্নেহপূর্ণ স্বরে উচ্চারিত হইতে শুনিল, "আপনি এসেচেন, কি সৌভাগ্য আমার!"

অন্ধকারটা চোখে সহিয়া গেলে মীরা অগ্রসর হইয়া রোগীর অদূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছেন এখন?"

"ভাল না, যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য মনে হচ্চে, এমনি অভাগ্য আমি— আপনি এলেন, উঠে আপনাকে অভ্যর্থনা করতেও পাল্লাম না।"

মীরা শান্ত কণ্ঠে কহিল, "কিছু দরকার নেই ত। আপনি ভাল হোন সে সব পরে হ'বে তখন।"

হিমাংশু বলিল "আমি ভাল হব, আপনি কি মনে করেন এসব রোগ ভাল হয়?" মীরা শিহরিয়া উঠিল। কৈ এ কথা ত সে একবারও মনে করে নাই। রোগ হইলে সারে বই কি। প্রাণ-পণ সেবা, একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ চিত্তের প্রার্থনা ইহারও কি কোন মূল্য নাই? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এই আত্মীয়-হীন প্রবাসী যুবার সেবার ভার সে নিজে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আরাম করিয়া তুলিবে, ইহাই তাহার প্রাণের একান্ত কামনা হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের উৎকণ্ঠা চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিলেও সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি যে বলেন, কি এমন হয়েছে যে ভাল হবেন না?"

সন্ধ্যার পর অন্য সেবকদের সহিত ভাগ করিয়া রাত্রি জাগরণের ভার মতিয়ার উপর দিয়া, তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া মীরা বিদায় চাহিলে হিমাংশু কহিল, "সারাদিন বদ্ধ ঘরে খুব কষ্ট হ'ল আপনার—

কিন্তু আজ বড় সুখে—এই কথাবার্ত্তায় দিন্‌টা কেটেছিল ; কাল ত আর আপনাকে আস্‌তে বল্‌তে পারি না।”

মীরা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল “আজও ত আসতে বলেন নি নিজেই এসেছিলাম। কালও আস্‌ব বই কি, নিশ্চয়ই আস্‌ব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। মানব-চিত্তেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে প্রায় দেখা যায় না। সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্বেও কেমন করিয়া মীরা যে তাঁহাকে নিজের মনের নিভৃত অংশে স্থান দিয়া বসিল, তাহা সে নিজেই কিছু বুঝিল না। মনে করিল স্বজন-পরিত্যক্ত বিদেশীর প্রতি এই যে আকর্ষণ, এ শুধু পীড়িতের প্রতি সহানুভূতি; আলোক-বিহীন স্থানের উদ্ভিদকে আলোকে আনয়ন করিলে সে যেমন সতেজে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার প্রিয়জনদের হারাইয়া অনুশীলনাভাবে তাহার হৃদয়ের যে অংশটা বৰ্দ্ধিত হইবার অবসর পায় নাই, হিমাংশুর সম্ভ্রমপূর্ণ আদর-আপ্যায়নে সে অংশটা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। সহসা তাই এই অপরিচিত সেই চিররুদ্ধ অন্তরদ্বারে স্নেহপ্রার্থী বিদেশী যখন অতিথির বেশে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা জানাইল, তখন সে তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। সে তখনও জানিত না যে, গৃহ তাহার নিজের নয়; তাহার অজ্ঞাতে জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তাহা কোন্ অপরিচিত অশ্রুতনামার হস্তে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সে এখন প্রহরী মাত্র। তাই যখন সে জানিল তখন হইতে সাবধানে নিজেকে দুরে রাখিয়া অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিতে কৃতনিশ্চয় হইল।

কিন্তু যখন সে শুনিল তিনি পীড়িত এবং জীবন মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থিত তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। তীব্র দুঃখের আশু সম্ভাবনার কথা মনে হইতেই, প্রস্তর-ব্যবধান-অপসৃত জলরাশির ন্যায়

তাহার অন্তরের রুদ্ধ স্নেহ-স্রোত সহসা এই স্নেহপ্রার্থী বিদেশীর জন্য সহস্র ধারে উৎসারিত হইয়া পড়িল। তিনি যে তাহার কাছে কতখানি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় তাহার আকণ্ঠ রাঙ্গা হইয়া উঠিলেও, ব্যথা মিশ্রিত একটা আনন্দও যে তাহাতে নিহিত না ছিল এমন নয়। রাধাকিশোর বলিয়াছিলেন, "মীরাকে তিনি ভালবাসেন।" অনিচ্ছাতেও এই কথা কয়টী দিবারাত্র তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিতেছিল। 'ভালবাসা কি মধুর, কি মিষ্ট। বিশেষতঃ তাহার কাছে ভালবাসা কি মধুর যে জগতের বাহিরে বাস করিয়াছে— অপরের ভালবাসা যে কখনও পায় নাই, এবং অপরকে ভালবাসিবার অবসরও যাহার কখন হয় নাই। মীরাকেও যে কেহ ভালবাসিতে পারে, এ কথা সে কখন ভাবিয়াও দেখে নাই। তাই তৃষিতের ওষ্ঠে সুধাপাত্রের ন্যায় যখন সুমধুর পানীয় তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে উপস্থিত, তখন তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে হইল পানের আবশ্যকতা নাই। অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা। অথচ যাহাকে সে ভালবাসে না, যাহার নাম শুনিলে হৃৎকম্প অনুভব করে, সেই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন! ইহ-পরলোকের কাণ্ডারী, তাহাকেই ভালবাসিয়া নারীজীবন ধন্য করিতে হইবে। ইহাই তাহার বিধিলিপি!

রাত্রে মতিয়া বাড়ী নাই। মেজের বিছানায় অপর একজন দাসী ঘুমাইতেছিল। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মীরা বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে অপর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্নালোকে সারা বিশ্ব হৈম-কিরণময়— কেবল তাহারই হৃদয় ভবিষ্যতের দুর্ভাবনার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বাগানের গাছগুলা চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া পথের উপর

দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তৃত করিয়া দিয়া বিস্তীর্ণ পত্রশাখার সর্ সর্ শব্দ তুলিয়াছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ; অদূরে বেলাপ্রহত তরঙ্গের ধ্বনি। ধরণী সৌন্দর্য্যময়ী। যৌবনের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া মীরা ভাবিল "তাহার মত দুর্ভাগিনীর মৃত্যুই ভাল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হিমাংশুনাথের পীড়ার গতি হ্রাস না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। বন্ধুবান্ধবেরা হতাশ হইতেছিলেন, ডাক্তার আশার কথা কহেন না। মীরা ভীত হইল, সে সর্ব্বদাই রোগীর নিকট থাকে, ডাক্তাররাও তাহার কাছে কোন বিষয় গোপন করেন না। অসঙ্কোচে সকল কথা খুলিয়া বলেন। তাহার মনের বল কতটুকু তাহাও ভাবিয়া দেখেন না। ভাবে কেবল মতিয়া, সে দেখিতেছিল রোগীর সহিত সেও বুঝি রোগী হইয়া পড়ে! স্বর্ণলতা দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছিল। আর একজন লক্ষ্য করিত, সে সিভিল সার্জ্জন সতীশচন্দ্র। একজন সম্বন্ধহীন যুবকের জন্য মীরার এতটা বাড়াবাড়ি সতীশচন্দ্রের ভাল লাগিত না—সে ইহা তেমন অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতেও পারিল না। ডাক্তারের চোখে ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি—ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠের স্বর অনেক সময় মীরাকেও ভীত করিয়া তুলিত। কে জানে এই আসন্ন-মৃত্যু মানবের উপকার করিতে আসিয়া সে কোন ক্ষতি করিয়া বসিল কি না! যন্ত্রণায় জ্বরে অনেক সময় রোগীর জ্ঞান থাকে না। তবু মীরার কণ্ঠস্বরে সেও যেন অনেক সময় চমকিয়া চক্ষু মেলিয়া চায়। মীরা ঔষধ দিলে বিনা প্রতিবাদে খাইয়া ফেলে। তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে রোগীর চক্ষু বারবার দ্বারের পানেই ঘুরিতে থাকে। জ্বরের ঘোরে রোগী এমন সব অস্ফুট অসংলগ্ন ভাষা উচ্চারণ করে, যাহা তৃতীয় কর্ণে প্রবেশ করিলে মীরা মরমে মরিয়া যাইবে। কিন্তু এই কয়দিনের ঘাত-প্রতিঘাতে সে অনেকখানি সাংসারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে। মীরা বুঝিয়াছিল, তাহার কথা এখন সাধারণের মুখে মুখে

হয় ত আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা' হউক, লোক-নিন্দাকেও সে আর ভয় করে না—ডাক্তারকেও না—সে এখন রোগীর জীবনের ভাবনায় অস্থির, এ সব ছোট খাট চিন্তার সেখানে স্থান ছিল না।

একদিন মীরা তাহার জ্যেঠা মহাশয়কে বলিল,—"জ্যেঠা মহাশয়! ডাক্তার সোয়াব্জীকে ডাকুন, এ সব কাটা-ছেঁড়ার ভিতর যাবেন না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই ভাল। কাল সারারাত আমি ঐ সম্বন্ধে অনেকগুলা বই পড়ে ফেলেছি। ওতে অনেক দুরারোগ্য রোগ ভাল হয়।"

রাধাকিশোর গম্ভীর মুখে গুম্ফ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিলেন, "আমিও সে কথা বলেছিলুম মা! কিন্তু ওঁরা তা মানচেন না; বল্লেন 'আরশোলা আবার পাখী, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আবার চিকিৎসা!' তা এখনকার দিনে অস্ত্র-চিকিৎসায় খুব ভয়ও নাই।"

মীরার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল; সে কহিল "তা' ব'লে এমনি করে ওরা ওঁকে খুন কর্‌বে, কেউ মানা কর্‌বে না?"

"কে কর্‌বে মা—ডাক্তাররা, সিভিল সার্জ্জন নিজে বল্‌চেন, অস্ত্র-চিকিৎসা ছাড়া উপায় নেই।"

তখন প্রবল অবজ্ঞাভাবে মাথা নাড়িয়া মীরা কহিল, "ঐ ডাকাতের হাতে—" পরমুহূর্ত্তে রাধাকিশোরের ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টি হইতে চোখ ফিরাইয়া বলিল, "তা'ই হোক্—এমনি করেই তা'হলে ওঁর ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাক্।" কথা কয়টা বলিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখনই বাহিরে অন্য ঘরে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইতে শুনা গেল। রাধা-

কুণ্ডোর বিদুরের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধের অভিজ্ঞ-দৃষ্টিতে আর কোন কথাই ছাপা রহিল না।

ছয়দিন ছয় রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মীরা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইল। সেখান হইতে কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না। মতিয়ার অনুনয় বিনয় তাড়নায় একবার মাত্র স্নানাহারের জন্য সে বাহিরে যায়; অভুক্ত অন্ন যেমন তেমনি পড়িয়া থাকে, সে উঠিয়া পড়ে। মতিয়া ললাটে করাঘাত করে, কাঁদিয়া অনর্থ বাধায়, মীরা চুপ করিয়া থাকে। বাহিরের ভদ্রলোকেরা রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সে পর্দার অন্তরালে বসিয়া থাকে, ডাক্তারদের সম্মুখে সে অসঙ্কোচে বাহিরে হয়, তাহার ন্যায় সুন্দরী যুবতীর পক্ষে স্ত্রীলোক-হীন বাড়ীতে একজন অল্প বয়স্ক যুবকের এরূপ সেবা শুশ্রূষা করা যে অনুচিত, সে কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। মতিয়া ইঙ্গিতে কোন আভাষ দিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া বলিত, "তুমি চুপ্ কর আয়ি—আমি আর খুকী নই ত—ভাল মন্দ নিজের জন্য ভেবে দেখব তখন।" মতিয়া চুপ করিয়াই থাকে। সে জানিত, মীরা যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই।

লোকে অনেকেই এই সেবা-নিপুণ ব্রাহ্ম বালিকার প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহার এই অসাধারণ শুশ্রূষা-নৈপুণ্য ডাক্তার সতীশচন্দ্রকে তেমন সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, সে জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও চলে না; কারণ এরূপ অবস্থায় মনে একটু সন্দেহ হইতেই পারে; তাহার উপর মীরার দেহের অবস্থাও ভাল নয়। ডাক্তার ভাবিল, এ কি হইল? রোগীর চিন্তা অপেক্ষা শুশ্রূষা-কারিণীর চিন্তাতেই সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

"তোমার শরীরে এত পরিশ্রম সহিবে কেন ?" বলিয়া বারবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার অনুরোধে ব্যর্থকাম হইয়া বেতনভোগিনী শুশ্রূষা-কারিণীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, মীরা মাথা নাড়িয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল,—"মতিয়া আছে, অপর কাহাকেও প্রয়োজন হইবে না।" ডাক্তার দেখিলেন, মতিয়া নামে আছে, কাজে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। হতাশ হইয়া রাধাকিশোরের শরণ লইলে, রাধাকিশোর কহিলেন,—"মীরা, বাড়ী চল। তোমার শরীর বড় খারাপ হচ্চে,—এখানে আমরা পাঁচজনে আছি।" মীরা তাহার জলভরা কালো চোখের মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি রাধাকিশোরের মুখে স্থাপিত করিয়া কহিল,—"জ্যেঠামশাই ! আপনিও নিষ্ঠুর হ'বেন না। আহা, ওঁর যে কেউ নেই।" বৃদ্ধ ভাবিলেন, সমাবস্থাপন্নের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক। তাঁহার চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট-তলে রেখার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অথচ সে করুণ আবেদনের স্বরকে উপেক্ষা করিতেও পারিলেন না। ডাক্তারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "করুক, নিজের কাজ করে নিতে দাও সতীশ, নারীর পক্ষে যে আর্ত্তসেবাই সব চেয়ে প্রধান ধর্ম্ম।"

রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছিল। দিন রাত্রির মধ্যে জ্বর ছাড়িত না, কমিতও না। যন্ত্রণার অস্ফুট কাতরধ্বনি অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় নির্গত হইতেছিল। এত যে সেবা, যত্ন, ঔষধ-প্রয়োগ, সমস্তই ভস্মে ঘৃতপ্রয়োগের ন্যায় নিষ্ফল হইতেছিল। মীরা সমস্তই দেখিতেছিল, রোগীর জীবন সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব অসঙ্কোচে ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাছে মতামত প্রকাশ করেন। ডাক্তার কহিলেন "অন্ত্রের মধ্যে ফোড়াটা পাকিতেছে, অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক।" মীরা

নিরুপায়ের উপায় ভগবানকে স্মরণ করিল। সে কি করিবে, কাহার পরামর্শ লইবে? সহায়-হীনা দুর্ব্বল নারী, কতটুকু তাঁহার বল? কোন অবলম্বনই সে খুঁজিয়া পাইল না। রাধাকিশোরকে মিনতি করিয়া কহিল, "জ্যেঠামশায়! আপনি ওদের বারণ করুন, অস্ত্রোপচার কর্‌লে উনি বাঁচ্‌বেন না। হয় ত ক্লোরোফরম কর্‌লে আর জ্ঞানও ফির্‌বে না।" মীরার চক্ষু অশ্রু-সমাচ্ছন্ন; রাধাকিশোর ম্লান হাসির সহিত উত্তর দিলেন,—"কি বল্‌ব মা, দেখ্‌চ ত সবই। ডাক্তাররা সবাই এক কথা বল্‌চেন, এর আর দ্বিতীয় ওষুধ নেই যে মা!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভোরের আলো অন্ধকারের পর্দা ঠেলিয়া সবে মাত্র প্রকাশ হইতে চাহিতেছিল। নক্ষত্র নিবিয়া গিয়াছে। চন্দ্রদেব ক্ষীণরেখায় তখনও গগন-সীমান্তে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান।

সারা রাত্রি জাগিয়া ভোরের দিকে মীরার তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে পাখা হাতে রোগীর বিছানার পাশে বসিয়া ঢুলিতেছিল। অদূরে ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া খানিক পূর্ব্বে মতিয়া নিদ্রা গিয়াছে। সহসা হিমাংশু পাশ ফিরিতেই মীরার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে ঘড়ির পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া নত হইয়া রোগীর মুখের কাছে ঔষধের গ্লাস ধরিল,—"ওষুধটা খেয়ে ফেলুন।" রোগী চোখ মেলিল, বিস্ফারিত চক্ষু মীরার মুখের উপর স্থির করিয়া রহিল, যেন কিছু বলিতে চাহিতেছিল, অথচ বলিতে পারিতেছিলে না। মীরা দেখিল, সে দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, এ কয়দিন তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। মীরার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমি মীরা।"

"মীরা"—রোগীর কম্পিত ওষ্ঠে মৃদু স্বরে উচ্চারিত হইল মীরা!—যেন অতীতের যবনিকা ঠেলিয়া কোন্ বিস্মৃত স্মৃতিকে পুনরায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে রোগী মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিল—"মীরা।"

মীরা মনের উৎকণ্ঠা গোপন করিয়া শান্ত ভাবে কহিল, "খেয়ে ফেলুন ওষুধটা।"

রোগীর দৃষ্টি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে ঔষধের গ্লাসটা ধরিয়া স্পষ্ট বাক্যে হিমাংশু কহিল, "মীরা—মিস্ রায়—মাপ্ করুন—আমার সব গোল হয়ে যাচ্ছে—"

খালি গ্লাসটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে রোগীর মাথায় পাখার বাতাস দিতে দিতে মীরা কহিল, "ডাক্তার বলেচেন, আজ জ্বর কমে যাবে, একবারে হয় ত নাও হতে পারে।"

সে রাত্রে মতিয়া ও অন্যান্য সেবকদের উপর রোগীর ভার দিয়া অনেক রাত্রে মীরা বাড়ী ফিরিয়া ঘুমাইয়াছিল। হিমাংশুনাথের বিকার কাটিয়া জ্ঞান দেখা দিয়াছে, জ্বরও খুব কমিয়া গিয়াছে। এখন রাত্রে রোগীর সেবার ভার লওয়া তাহার ন্যায় একজন অনাত্মীয় মহিলার পক্ষে অনুচিত, এ কথা কেহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া না দিলেও সে ইচ্ছা করিয়াই, বাড়ী ফিরিয়া গেল। ক্লান্তিতে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বাহিরের কাঁপড় পর্য্যন্ত ছাড়া হইল না, বিছানা স্পর্শমাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

বাগানের গাছের সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতের আলো সোনার রঙ্গে ফুটিয়া উঠিল; পাখীরা প্রভাতী গাহিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া মীরা শুনিল,—"ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন।" তখনও অবসাদে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, চোখের পাতা ভারী হইয়া রহিয়াছে। সে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "কি দরকার তাঁর যখন তখন আস্‌বার?"

মতিয়া সেই মাত্র ফিরিয়া ঘরের জানালা খুলিয়া দিতেছিল, মুখ ভারী করিয়া কহিল,—"ওকি মীরা! ওঁনার সম্বন্ধে এমন কথা বলো না।"

মতিয়ার সতর্ক সাবধানতা সহসা মীরাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল, বিছানা ছাড়িয়া খোলা চুলগুলা হাত দিয়া জড়াইতে জড়াইতে সে

ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কেন, উনি কি আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক—কেন বাপু যখন তখন আমায় এমন করে বিরক্ত করা !"

"মীরা—!" মতিয়ার আহ্বানে বেদনাপূর্ণ ভৎর্সনার স্বর ধ্বনিত হইল। শুনিয়া মীরা আত্মস্থ হইয়া চুপ করিল। তবু তাহার অভিমান ও বেদনামিশ্রিত অশ্রুজলে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ব্যথা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, ইচ্ছা করিতেছিল একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে, ওগো তোমরা আমায় মুক্তি দাও, নিষ্ঠুর ব্যাধের হস্ত হইতে আমায় ছাড়াইয়া লও; আমার আর সহ্য হয় না। কিন্তু সে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনবরত বিরুদ্ধ হাওয়ার সংঘাত সহিয়া সহিয়া তাহার অন্তরে যে প্রবল বিদ্রোহের ঝড় উঠিয়াছিল, বাহিরে তাহা অব্যক্তই রহিয়া গেল। মতিয়া কাছে আসিয়া নিষেধ আপত্তি সত্বেও অসংযত চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিতে দিতে কহিল, "চুলগুলা সব গেল যে বোন্! একটু শরীরের দিকেও চা, মীরা—এমন করে বাঁচ্‌বি কি করে বল্ দেখি ?"

জানালার বাহিরে শূন্য-দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া উদাস স্বরে সে উত্তর দিল,—"বাঁচবো বই কি, আমি আবার বাঁচবো না। এত সৌভাগ্য আর আমার হবে ?"

ইহার পরে মতিয়া আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস করিল না। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মীরা যখন নীচে নামিয়া আসিল, তখন সতীশচন্দ্র অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে তাহারই একখানা অয়েল্ পেন্টিং ছবি দেখিতেছিল। চুড়ী ও চাবির শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে কহিল—"শুন্‌লাম রাতে সেখানে ছিলেন না, এমনটা তো হয় না, তাই ভয় হলো অসুখ বিসুখ

বাধালেন বা ! যে কাণ্ডটা করেছিলেন,—তাই তাড়াতাড়ি আগেই এখানে চলে এলাম।" মীরাকে সুস্থ দেখিয়া ডাক্তারও যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন, তাহার কেশ বেশের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত আশঙ্কার কারণ তত প্রবল নয়, চেষ্টা করিলে ঐ দুর্ব্বোধ্য বিমুখ নারীচিত্তকেও হয় ত একদিন বশে আনিতে পারা যাইবে; রোগ তবে এখনও চিকিৎসার অতীত হয় নাই—এখনও আশা আছে। সেই সঙ্গে নারীজাতির হৃদয়ের লঘুতায় ওষ্ঠপ্রান্ত ঘৃণার হাস্যে ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল। উহারা অবস্থার দাস; মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনিশ্চিতের অনুসরণ করে না। নতুবা রোগীর চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ত্যাগ করিবে কেন? এতদিন মীরার বুদ্ধির প্রশংসা না করিলেও সে যে সেবা-যত্ন কিছু কিছু জানে, এইবার সে কথা ডাক্তার মনে মনে স্বীকার করিলেন।

মীরার মুখে বিরক্তির যে চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বরে তাহার আভাস পাওয়া গেল না, বলিল,—"আমি বেশ আছি, আপনার রোগীর খবর আগে বলুন, কেমন আছেন আজ—কি বুঝ্‌ছেন?"

ডাক্তারের ললাট-রেখা কুঞ্চিত হইল—"কি শুন্‌তে চাইচেন? বাঁচ্‌বে কি না?"

নিষ্ঠুর! এত বড় আঘাত এমন করিয়া কেহ কাহাকেও দিতে পারে কি? মীরা বিবর্ণ মুখে যন্ত্র-চালিতের মত কহিল—"হাঁ।"

"অপারেশন কর্‌লে বাঁচ্‌বে কি না বলা যায় না, তবে যন্ত্রণা নিশ্চয় যাবে।"

"না কর্‌লে?" মীরার স্বর উদ্বেগে কাঁপিতেছিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতেছিল।

"নিশ্চিত মৃত্যু!" ডাক্তারের স্বরে বা মুখে এতটুকু বিচলিত ভাব দেখা গেল না,—যেন পাথরে কোঁদা মূর্ত্তির মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হইল। মীরা দাঁড়াইয়াছিল, সে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া মিনতিপূর্ণ চোখে ডাক্তারের পানে চাহিয়া,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"কি করবেন আপনারা—তাঁর সম্বন্ধে কি করবেন—মনে করচেন?"

ডাক্তার অগ্রসর হইয়া একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে [illegible]—"বসুন, অত অধীর হচ্চেন কেন? মানুষ মাত্রেই জন্ম-মৃত্যুর [illegible] আমরা তাঁর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করচি—আপ্‌নি—[illegible] সাধ্য তার ঢের বেশীই করেচেন, ডাক্তার রোগ সারাতে পারে, জীবন দিতে পারে না। এখন আমাদের আর কোন সাধ্য নাই—দায়িত্বও ফুরিয়েচে, যাক্ এ প্রসঙ্গ ছেড়েই দিন্। আমাদের বিবাহে—"

"না—না,—" মীরা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এমন করে তাঁকে আমি যেতে দেবনা—মিঃ বসু। ওঁকে বাঁচান—বাঁচান, উনি না বাঁচ্‌লে আমিও মরে যাব।" সহসা স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া নতজানু হইয়া সে ডাক্তারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধ মুখে তাঁহার দয়া ভিক্ষা চাহিল।

সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় ডাক্তার ইহাপেক্ষা অধিক স্তম্ভিত হইত না। বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তরের রুদ্ধ ঈর্ষা জ্বালা গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় বাহির করিয়া দিয়া কহিল,—"মিস্ রায়! আপনি জানেন কার কাছে কি কথা বল্‌চেন! আমি অন্ধ তাই দেখেও দেখিনি, বুঝেও বুঝিনি, আপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেচি—এই তার উচিত ফল! কিন্তু এ ও জেনো মীরা! ও

বাঁচ্‌বে না—বাঁচ্‌তে পাবে না—ওর শেষ হয়ে এসেছে।" মীরার উত্তরের আশা না রাখিয়া, তাহার পানে না চাহিয়াই ডাক্তার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কপাটের সজোর শব্দের সহিত ভারি জুতার শব্দ মিলাইয়া গেলে মীরা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া পিতামাতার উদ্দেশে অনেক দিনের পর আজ প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল—"বাবা, বাবা! আমার এ কি করে গেলে, কেন এমন আদেশ দিয়েছিলে।"

মতিয়া মীরাকে খুঁজিতে আসিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। বুড়া রাধাকিশোরকে মনে মনে গালি দিয়া স্থির করিল, ম্যাজিষ্ট্র সাহেব আরাম হইলেই সে যেমন করিয়া পারে মীরার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবে। মীরার বাপ বলিয়াছেন, সতীশ বোস্‌কে যোগ্য বিবেচনা করিলে মীরাকে দান করিতে হইবে। মতিয়া তাহাকে যোগ্য বিবেচনা করে না—তাহার চাইতে মীরার শুভাকাঙ্ক্ষিণী কে? সে যখন যোগ্য বিবেচনা করে না, তখন সমস্যা ত মিটিয়াই গিয়াছে, মীরাকে এ কথা জানাইলেই গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু থাক্ দু'দিন,—দুইটা দিন পরে সে নিশ্চয় জানাইবে। কে জানে যদি ছেলেটি নেহাৎই না বাঁচে।

মীরার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মতিয়া কহিল—"আজ তাঁকে দেখ্‌তে যাবে না মীরা? আজ যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে—অন্তর করা হবে কি না।"

চমকিয়া মীরা উঠিয়া বসিল, অশ্রুগোপন না করিয়াই মুখ তুলিয়া বলিল—"হাঁ যাব বই কি দিদি!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মীরা যখন রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন ডাক্তারেরা পরামর্শান্তে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মীরা শুনিল, কাল অস্ত্রোপচার হইবে। সর্দ্দার খানসামা বীরভদ্র শুষ্কমুখে কহিল, "সাহেবের জ্ঞান হয়েচে,—বল্‌ছিলেন, কাটাকুটি হ'লে তিনি এক দণ্ডও বাঁচ্‌বেন না।"

মীরা উত্তর দিল না, ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সূর্য্যের আলো সার্সির মধ্য দিয়া দেওয়ালের গায়ে, ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে। রোগীর দৃষ্টি দ্বারের দিকেই নিবদ্ধ। মীরা ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার শীর্ণমুখে, ম্লানচোখে আনন্দের একটা উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল,—"এসেচেন,—আপনার কথাই—এই এখনও এলেন না কেন, তাই ভাব্‌ছিলাম।"

মীরা হাসিবার চেষ্টা করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, "কেমন আছেন আজ, রোজ এক কথা শুন্‌ব না বলুন,—ভাল ?" সে একখানা চেয়ার টানিয়া নিকটে উপবেশন করিয়া মাথা তুলিয়া লইলে হিমাংশু কহিল, "ভাল ?—হুঁ ভাল বই কি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বদলে ফাঁসির হুকুম,—তা'তে মুক্তির আনন্দ আছে, সন্দেহ কি ?"

মীরা চোখ নামাইয়া নতমুখে কহিল—"তার মানে ?"

"কেন, আপনি কি শোনেন নি, কাল অপারেশন করা হবে ?"

মীরা করুণ-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া কহিল—"অপারেশনে ভয় পাচ্চেন আপনি ? তবে রাজী হ'লেন কেন ?"

"আমায় ভাগ্য-বিধাতা রাজী করালেন যে। ডাক্তার সাহেব বল্লেন,

এ রোগের দ্বিতীয় ওষুধ নেই, অপারেশন আমার করাতেই হবে, তা' ক'রে ফেলাই ভাল—অজ্ঞানে যে যন্ত্রণা সহ্য হয়েছিল, এখন আর তা সহ্যও হয় না।"—হিমাংশুর শীর্ণ ওষ্ঠে এ অবস্থাতেও রহস্যের একটুখানি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।—"সুবিধা এই যে, আমার জন্যে শোক করবার কাউকে আমি জগতে রেখে গেলাম না।"

মীরা শান্ত ভাবে কহিল—"আমরা যদি অপারেশনে আপত্তি করি?" তাহার স্বরে দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল।

"তা, তাঁরা মানবেন না—তাঁদের মতে এই-ই শেষ উপায়—এতে ভাল হয় বেশ, না হয় নাচার—দশ্বাবার সময় দিতে তাঁরা আর রাজি নন; আমার আলাপী বন্ধু-বান্ধবেরাও ওঁদের মতে মত দিয়েচেন।"

মীরা কহিল—"ডাক্তার সোরাবজী খুব বিচক্ষণ লোক; আমার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথিতে আপনি আরাম হবেন।—আপনি মানা করুন ওঁদের—।"

হিমাংশু হাসিল। ঘন মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় অতি মধুর অতি ক্ষীণ সে হাসি, "সে কথা রাধাকিশোর বাবু ব'লেছিলেন, তা' হয় না; এখন আর চিকিৎসার সময় নেই, অপারেশনের কালও উত্তীর্ণ হচ্চে, এই ওঁদের মত।—আমি রোগী, সুতরাং নিরুপায়। বারণ করবার লোক ত নেই।"

মীরা নত হইয়া হস্তচ্যুত তালবৃন্তখানা কুড়াইয়া লইতে লইতে কহিল, "কিন্তু আমি ত আছি।" তাহার ভাষা অস্পষ্ট, ভাবও অস্ফুট—তবু হিমাংশুর হৃদয়-যন্ত্রীতে তাহা কেমন নূতন সুরে ঝঙ্কার দিয়া ধ্বনিত হইল। মনে মনে সে ভীতও হইল, বুঝি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ধারণা শক্তি হারাইয়া

কেলে ! "আপনি—আপনার ঋণ এ জন্মে আর শোধ হ'ল না, থাক্ এ সব কথা না তোলাই ভাল।—অনেক করেছেন, আপনার জনেও এত কর্তে পারে না ; তবু এতগুলা প্রবল যুক্তির কাছে আপনার কথা টিক্‌বে না—কেউ মান্‌বেনও না।"

মীরা তাহার উজ্জ্বল চোখের অপলক স্থির দৃষ্টি রোগীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল—"মানবে না, কেন ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া হিমাংশু কহিল—"আপনি ছেলেমানুষ। ডাক্তারি শাস্ত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কি ? আর—" অপ্রিয় সত্য বলিবার নিষেধ বাক্যটা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় সে বাকী কথাটা শেষ করিল না।

"আর—বল্‌বেন আমার এখানে কথা বলবার অধিকারই বা কি ?—আমি যদি বলি সে অধিকার আমার আছে।" তাহার কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস চোখে মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটাইয়া তুলিল। হিমাংশু রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের পানে চাহিল। মৃত্যুদ্বারের পথিক প্রতি-মুহূর্ত্তে অন্ধকারের অতল গহ্বরে পতন প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছে, তাহার মনেও যেন কি একটা অন্ধ আশার জ্যোতিঃ অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। বুকের ভিতর রক্তস্রোত তোলপাড় করিতেছিল। দুর্ব্বল দেহে মনের ক্রিয়াও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তা করিবার সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। সে কেবল উদ্বেগ-ব্যাকুল বক্ষে, উৎকণ্ঠিত চক্ষুর বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মীরার লজ্জানত অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখের উপর ধরিয়া রাখিল, কোন প্রশ্ন করিল না।

বাহিরে রৌদ্র চড়িয়া উঠিতেছিল, সার্সির ভিতর দিয়া তাহার আলোক-

বিন্দুগুলি বৃত্তাকারে রোগীর বিছানার উপর রেখাপাত করিতেছিল। মীরা তাহার উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া যেন জানালাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুত-কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"আমার স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য ডাক্তারদের আমি বল্‌ব—আর সে কথা তারা শুনতে বাধ্য হবে, আমি বল্‌ব—" বাকি কথাটা ঠোঁটের মধ্যেই রহিয়া গেল, স্পষ্ট উচ্চারণ হইল না—হইবার প্রয়োজনও আর ছিল না।

জানালা বন্ধ করিয়া, অনিচ্ছুক মৃদুগতিতে পা দুইটাকে কোনও মতে টানিয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পর্য্যন্ত স্তব্ধ গৃহ তেমনি নিস্তব্ধ। কেবল কাষ্ঠাধারের মধ্যে বড় ঘড়িটার দোলন-যন্ত্রের টক্‌ টক্‌ শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নাই।

আকস্মিক উত্তেজনার বশে নিরুপায়ে নারীজন-বিগর্হিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া এইমাত্র যে স্বীকার-বাণী সে উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার লজ্জায় তখনও তাহার আকণ্ঠ রাঙ্গা হইয়া রহিয়াছে। বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া বুঝি অপর কর্ণেও প্রবেশ করিতেছিল। তবু নিদারুণ লজ্জার মধ্যেও মুক্তির একটা তীব্র আনন্দ সে অন্তরে অন্তরে প্রবল ভাবে অনুভব করিল। এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যে অস্ফুট ভাব তাহার নিজের কাছে সবে মাত্র প্রস্ফুট হইয়াছে, ভয় হইতেছিল, পাছে সে কথা তাঁহাকে জানাইবার আর অবসর না পাওয়া যায়। সে নিজেকে চিনিয়াছে—কিন্তু বড় বিলম্বে। এখন প্রাণপণ সাধনায় এ তপস্যার সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। এই মৃত্যুদ্বার সমাসীনকে নিজের চেষ্টায় ফিরাইতে হইবে। তা সে না পারিবে কেন? দুইজনেই যে তাহারা দুইজনকে

একান্ত ভাবেই চাহিতেছে, এ আকর্ষণ-বেগ কি কাটাইয়া যাওয়া যায়?

প্রতিপক্ষের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মীরা ইহাতে একটু যেন বিস্মিত হইল, ভীত হইয়া রোগীর নিকটে—অতি নিকটে ফিরিয়া আসিল, ব্যাকুলভাবে তাঁহার গায়ে হাত দিল,—শ্রান্ত বাহুদুটি এলাইয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে। হাত নাড়িয়া দেখিল, দেহে সংজ্ঞার কোন চিহ্ন নাই, কেবল পাণ্ডু অধরে পরমানন্দের মৃদু মৃদু হাস্যরেখা। অর্দ্ধ-নিমিলিত দুটি আত্মসমাহিতের ন্যায়। যেন সকল যন্ত্রণার অবসানে রোগী সুস্থ শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

মীরা চীৎকার করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। দেবতা পূজার অঞ্জলিটি মাত্র গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

যমজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গল্প নয়। সত্য ঘটনা। দেবেন্দ্রের কণ্ঠচ্যুত মন্দাকিনী-সলিলসিক্ত স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণ দুইটী স্বর্গের পারিজাত একদা উষার ঈষৎ আবছায়ার প্রভাতের তরুণালোকে দুইটী স্নেহ-প্রবণ নরনারীর শূন্য কোল পূর্ণ করিতে একই দিনে একই মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়াছিল।

শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রালোক গাছের পাতায়, নদীর জলে, অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। অস্তগামী অরুণালোক নদীর জলে দীর্ঘ শ্যামচ্ছায়া বিস্তার করিতেছিল, পরিপূর্ণযৌবনা বিপুলকলেবরা শোন গভীর গর্জ্জনে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণ সফেন তরঙ্গাঘাতে কূলের মৃত্তিকাখণ্ড ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নদীর জলে পড়িতেছিল। দূর অরণ্য হইতে আর্দ্র মৌরী ও কুটজ কুসুমের সৌগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই নীরব অরণ্যানীর বাহিরে দূর পর্ব্বতের দিকে পশ্চাৎ করিয়া একটী ক্ষুদ্রাকৃতি জৈনী বালিকা শোনের তীরদেশে দাঁড়াইয়াছিল। চঞ্চল পার্ব্বত্য বায়ু বালিকার মুক্ত কুন্তল দোলাইয়া খেলা করিতেছিল। বালিকার চঞ্চল চক্ষু মধ্যে মধ্যে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় পশ্চাতে ফিরিতেছিল। এই সময় দূর অরণ্যানীর মধ্য পথ দিয়া আর একটী চঞ্চলা, হাস্যমুখী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা, অতি মধুর কলঝঙ্কারের মত সুধাপূর্ণ স্নেহকণ্ঠে ডাকিল,—

"দিদি!"

শেষদান

নির্জ্জন প্রান্তরভূমি, চঞ্চল নদীর জল, পর্ব্বতের প্রত্যেক শৃঙ্গ ঝঙ্কৃত—মুখরিত করিয়া প্রতিধ্বনি বাজিল—"দিদি !"

"অনিলা !"

মুহূর্ত্তে দুই ভগ্নী পরস্পরের আলিঙ্গন বদ্ধ হইল।

অনিলা ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "আমি তোমায় সেই পর্য্যন্ত খুঁজ্‌চি দিদি ?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে অমিলা ভগ্নির মুখের চুলগুলি সরাইতে সরাইতে বলিল, "তুমি তখন ঘুমিয়েছিলে ভাই, তাই তোমায় ডাকিনি।"

এই কথার পর বিবাদ মিটিয়া গেল, তারপর দুই বোনে হাত ধরাধরি করিয়া নদীতটে শীলাপরি আসিয়া বসিল। একই দিনে একই সময়ে দুই যমজা ভগ্নী জন্ম গ্রহণ করিলেও অমিলা ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী ; আর অনিলা পরিপুষ্টদেহা, আপন রূপরাশিতে ছল্ ছল্ ঢল্ ঢল্ করিতেছিল। তদ্ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতিতে দুই বোনে তিলমাত্র প্রভেদ ছিল না। স্বভাবে অনিলা কিছু চঞ্চলা। নদীতীরে শীলা'পরি বসিয়া পরস্পরের কথা হইতেছিল। অনিলা চঞ্চলভাবে নদীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা আজ এলেন না দিদি ?

ঈষৎ প্রফুল্লমুখে অমিলা বলিল, "আজ না এলেই ভাল হয়, শুনেচ ত নদীর বেগে পুল ভেঙ্গে গ্যাছে।"

"শুনেচি। তবে কি হবে ? যদি বাবা আসেন ?"

অনিলা। "বাবা সেদিন বল্‌ছিলেন, 'পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তিনি মঙ্গল কর্‌বেন, তাঁকে ডাক।,"

তারপর দুইজনে যুক্তকরে মুদিত নেত্রে ঈশ্বরের মহিমা গান আরম্ভ

করিল, নির্জ্জন বনভূমি সুমধুর শিশুকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে একজন অর্দ্ধবয়স্ক ভদ্রলোক বালিকা-দুইটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন —সেই সুধাময় ও মধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া গদ্‌গদ্‌ভাবে দাঁড়াইলেন, সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার তখন নামিয়া আসিতেছিল। দূরে জৈনাচার্য্য মহাবীরের মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল। গান শেষ করিয়া দুই বোনে উঠিয়া দাঁড়াইল ও স্নেহ-আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল, "বাবা!"

গভীর স্নেহে কন্যা দুইটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সুরপতি বাবু বলিলেন, "এখানে কি হচ্ছিল মা?"

পিতার স্নেহ-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মুখের উপর হইতে চুলের গোছা অবজ্ঞাভরে সরাইয়া ফেলিয়া অনিলা পিতার আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "তুমি কেন এত রাত করে এলে? যা ভয় কর্‌ছিল।"

"তাই বুঝি তোরা আমার জন্যে বসেছিলি?"

"দেখ বাবা, তুমি যদি এমনতর নদীর বেগ বাড়্‌লে আস, তা' হ'লে তোমায় আর যেতে দোব না।"

"কেন বল ত?"

"আমাদের যে ভয় করে, যদি নৌকা ডুবে যায়?"

দুইজনেই এইবার দৃঢ়ভাবে পিতার হস্ত ধারণ করিল, বুঝি তাহা-দের সেই গভীর স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া তাহাদের পিতাকে তাহারা নিরাপদে রাখিতে চায়। সস্নেহে কন্যাদের মুখ চুম্বন করিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "তোরা আমায় এত ভালবাসিস্‌ বুড়ি!" তাঁহার চক্ষু হইতে মুক্তার মত দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে বালুকাসিন্ধুর কূলে শোনের শান্ত প্রবাহরাশি অলসভাবে বহিয়া চলিয়াছে। তখন শোনের সেই সৃষ্টিসংহারিণী ভয়ঙ্করী ভাব নাই, জ্যৈষ্ঠের দারুণ উত্তাপে বিশালদেহা শোনও স্থির গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। দীর্ঘ পীড়াশান্তির পর যেন তাহার শীর্ণদেহ অলস-ভাবে শায়িত আছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হওয়ায় তীর-সংলগ্ন নদী-সৈকত আর্দ্র রহিয়াছে। কসাড় বনে "বউ কথা কও" পাখীর মর্ম্মব্যথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। বহু দিনের পর উত্তপ্ত ভূমিতে বৃষ্টিপাত হওয়ায় একটা মধুর আর্দ্র-গন্ধ উত্থিত হইতেছিল। সেই তরঙ্গ-মাতা-ধ্বনিত বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ পোলের অনতিদূরে শ্যামল তৃণমণ্ডিত তীরদেশে বসিয়া দুই ভগ্নীতে বীণা বাজাইতেছিল। জৈনীরা স্বভাবতঃ একটু গীত-বাদ্যানুরাগী, তদ্ভিন্ন অমিলা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়া। ধনী পুত্রসন্তানহীন সুরপতিও সাধ্যমত কন্যাদের সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। চঞ্চলা অনিলা কিন্তু তাহার দিদির মত এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে পারে নাই। অমিলার আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ তরঙ্গায়িত কেশরাশি অবাধে অংসে পৃষ্ঠে বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুগোল ক্ষুদ্র বাহুতে সুবর্ণ কঙ্কণ বড় সুন্দর শোভা পাইতেছিল। শুভ্র বসন ভেদ করিয়া অঙ্গজ্যোতিঃ ফাটিয়া পড়িতেছিল। বিশাল চক্ষের শান্ত কোমল হাস্যময় দৃষ্টি ভগিনীর মুখের উপর ন্যস্ত। বালিকা সাক্ষাৎ বীণাপাণির মত বীণা বাজাইতেছিল। কি সুন্দর! কি স্বর্গীয় দৃশ্য! দূর হইতে দেখিলে আপনা হইতে মস্তক নত হইয়া আসে। বালিকা যথার্থই দেবীর অংশ-সম্ভূতা! সামান্য মানুষে নহিলে কি এ লাবণ্য সম্ভবে!

বীণা বড় করুণ সুরে বাজিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ জনসঙ্গহীন নদী-সৈকত, নীরব অরণ্যানী, অসীম আকাশ প্লাবিত করিয়া করুণ বীণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ গাহিতেছিল। চির-সুখ-লালিত পালিত বৃদ্ধ রাজার একমাত্র হৃদয়ানন্দ বংশের প্রদীপ আজ জরা মৃত্যু দুঃখ শোকের দৃশ্যে সংসারত্যাগী! এ সংসার কি? কে আমি? কেন লোকে আমার আমার করে? কে কার? ক্ষণিক সম্বন্ধ—যেমন জলের উপর জলের তরঙ্গ আঘাত করে ও মুহূর্ত্তে বিলীন হয়। ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনও তদ্ভিন্ন আর কিছুই ত নয়। বালিকার বিশাল চক্ষে জলধারা বহিল, ত্রস্তে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অমিলা ভগ্নীর দিকে চাহিল।

অমিলা অর্দ্ধগ্রথিত কদম্ব ফুলের মালাগাছটা চখের উপর ফেলিয়া দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে হাতে মাথা রাখিয়া দিদির দিকে চাহিয়াছিল—তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছিল। দিদিকে আসিতে দেখিয়া সে একটু আগ্রহের সহিত বলিল—"মানুষ মরে কোথায় যায় দিদি?"

অমিলা আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "কেন অনি?"

"আচ্ছা দিদি! আমরা যখন মরে যাব, তখন কি এমন করে এক জায়গায় থাক্‌তে পাব?"

"ও কথা কেন বল ভাই?"

"দেখ দিদি! আমার মনে হয়, আমরা শীঘ্রই সেখানে যাব, দুজনে এক জায়গায় থাকব। হ্যাঁ দিদি, থাকৃব ত?"

আদরের বীণা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে ভূমে ফেলিয়া অমিলা ভগ্নীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "অনিলা! তোকে

ছেড়ে আমি একদিনও যে থাক্‌তে পার্‌ব না ; যেখানে যাব দুজনে একসঙ্গেই যাব, কেমন ভাই !"

তারপর দুই ভগ্নীতে উঠিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আকাশে চাঁদ নাই, মধ্যে মধ্যে মেঘের ঈষৎ গুরু গর্জ্জন ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। দুই বোনে চঞ্চল পদে বাড়ী ফিরিতেছিল। বুঝি প্রকৃতির সহিত তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়েরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। যেমন হাসিমুখে তাহারা আসিয়াছিল, বুঝি ঠিক তেমনটী ফিরিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আর আশা নাই!

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ সুধার হাসি হাসিতেছিল। সারাদিনের পর সকলের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে এইমাত্র অনিলা দিদির বিছানা ছাড়িয়া জ্যোৎস্নালোক-হসিত কাননতলে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কাণের কাছে ডাক্তারের সেই নিষ্ঠুর বাণী বাজিতেছিল!—আর আশা নাই! সত্যই কি তাই! সত্যই কি তাহার দিদি তাহাকে ছাড়িয়া কোন সুদূর দেবরাজ্যে চলিয়া যাইবে। সেই বিকচ কুসুম-শোভাময় রমণীয় উদ্যান, সেই মৃদু মধু গন্ধ-বাহী গগনপ্লাবী সমীরণ-বাহিত কোকিলের কুহুতান, সরসীর নির্ম্মল জলে চাঁদের ছায়া তেমনিই মধুর হাসি হাসিতে-ছিল, সেই মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর জলের ধারে আজিও ত অনিলা আসিয়া বসিয়াছে, তবে পাশে তার দিদি নাই কেন? নিষ্ঠুর রোগের যন্ত্রণায় আজ একুশ দিন দিদি তার শয্যাগতা, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, একুশ দিনেও যখন জ্বর না কমিয়া বাড়িতেছে, তখন আর আশা নাই। ডাক্তার মিথ্যাবাদী! তাই অমন কথাই বলিল। অনিলার দিদি তাহাকে ছাড়িয়া কি কোথাও যাইতে পারে? সে যে তাহার দিদিকে ছাড়িয়া এক দিনও থাকিতে পারে না; তবে তাহার স্নেহময়ী দিদি চির-দিনের মত তাহাদের ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইবে? না, তাহা কখনই হইবে না। নিতান্তই যদি যাইতে হয়, তবে সেও তাহার সঙ্গে যাইবে।

এইবার অনিলা অনেকটা সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি আসিয়া যেখানে শোক-বিহ্বলা সন্তানস্নেহ-কাতরা অশ্রুপ্লুতা অরুণময়ী ভূমি-লুণ্ঠিতা হইয়া

ইষ্টদেবতার চরণোদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়িতেছিলেন, তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। মুক্ত বাতায়ন-পথে ঘন তরুচ্ছায়া-মলিন জ্যোৎস্নালোক ছড়াইয়া পড়িয়া যেন অরুণময়ীর হৃদয়ের বিষণ্ণতাই ফুটাইয়া তুলিতেছিল, আর্দ্র বস্ত্রে তখন কেশেও সলিলকণা ঝরিতেছিল। হায়! অভাগিনী এই দারুণ মাঘের শীতে সিক্ত বস্ত্রে শুদ্ধচিত্তে দেবতার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনায় ভূমি-লুণ্ঠিতা হইতেছিল। তখনও অভাগিনী জানিত না—নিষ্ঠুরা আশা তাহাকে কিরূপে প্রতারণা করিবে!

অনিলা মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ডাকিল, 'মা!'

মধুমাখা সুধাকণ্ঠে অরুণময়ী চাহিয়া দেখিলেন, ম্লানমুখে অনিলা দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষু মুছিয়া কন্যাকে নিকটে টানিয়া অরুণময়ী সস্নেহে বলিলেন, "কোথা ছিলি মা?"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "মা শীগ্‌গীর এস, বাবু তোমায় ডাক্‌চেন।"

সুদূর-শ্রুত ঝিল্লিরব ও মধ্যে মধ্যে অস্ফুট বাতাসের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই শোনা যায় না। আজ সুরপতি বাবুর স্নেহের ধন, অরুণময়ীর নয়নতারা অমিলা ভীষণ জ্বরে অচৈতন্য। গৃহে অতি ক্ষীণালোকে সকলের বিষণ্ণ মুখ আশু অমঙ্গলের ছায়া বিস্তার করিতেছিল। কাছে বসিয়া অনিলা দিদির অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ কেশরাশি সযত্নে গুছাইয়া দিতেছিল। অমিলার মুখে কিছুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন নাই। এখনও সেই পূর্ব্বের একাগ্রতা-ভাব—স্নেহের ভাব মুখ কমলে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বালিকার সেই চির প্রফুল্ল সুধামুখ এখনও তেমনি স্নেহহাস্য-মণ্ডিত। নিষ্ঠুর রোগের যন্ত্রণাও সেই চির সহাস্য মুখ মলিন করিতে পারে নাই।

অনিলা দিদির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া সস্নেহে ডাকিল, 'দিদি !'

ডাক শুনিয়া সেই স্নেহবর্ষী সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। সেই হৃদয়প্রফুল্লকর মুখে সুমধুর হাস্যরেখা দেখা দিল।

বালিকা কথা কহিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, সুধু স্নেহময় নির্নিমেষ নেত্রে ভগিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার হাত দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন।

অরুণময়ী তখনও পাগলের মত বলিতেছিলেন—"ওগো ডাক্তার বাবু ! আমার মেয়েকে তুমি বাঁচাও, আমি সর্ব্বস্ব তোমায় দেবো।"

হতভাগ্য পিতা সব বুঝিয়া পাষাণের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেও বুঝি সাহস হয় না, কি জানি সেই অবসরে যদি তাঁহার স্নেহের নিধিটুকু ছাড়িয়া যায় !

ডাক্তার বাবু রুমালে চক্ষু মুছিলেন মাত্র।

অনিলা নিঃশব্দে সাগ্রহে তাহার দিদিকে জড়াইয়া ধরিল, বুঝি তাহার এ স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার স্নেহময়ী দিদি কোথাও যাইতে পারিবে না।

মুহূর্ত্তের জন্য অমিলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে কোমল শীর্ণ হস্তে ভগিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, অতি ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে বড় কষ্টে শ্বাস টানিয়া বলিল, "অনিভাই ! তাহলে যাই চল্।"

আর কথা ফুটিল না। ধীরে ধীরে মাথাটা একধারে হেলিয়া পড়িল।

অনিলাও মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি !"

তারপর এ জগতে তাহাদের কথা আর কেহ কখনও শুনে নাই। অস্ফুটন্ত গোলাপকলি স্বর্গের পারিজাত—না ফুটিতেই একসঙ্গে ঝরিয়া

গেল। নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ দুইটি ক্ষুদ্র-প্রাণ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। একই দিনে একই সময়ে দুইটি দেবশিশু সন্তানহীন নরনারীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে আসিয়াছিল, আর আজ এই দশ বৎসর পরে স্নেহময় জনক-জননীর পূর্ণ হৃদয় শূন্য করিয়া একই দিনে একই সময় ঝরিয়া পড়িল। তারপর সে করুণ দৃশ্য আর দেখিয়া বা শুনিয়া কাজ নাই।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রপুরের জমীদার বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সতীন্দ্রনাথের পত্নীর অসময়ে স্বর্গারোহণে—কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃকুলের লুব্ধ দৃষ্টি যুগপৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই সতীন্দ্রনাথের পুনরায় বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু বিপত্নীক সতীন্দ্র তাহার তিন বৎসরের শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি প্রকাশ করিল। বেশী দিন নয়, আজ ছয় মাস মাত্র তাহার প্রিয়তমা পত্নী নিরুপমা—তাহার স্বামী-পুত্রকে ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

শ্মশান হইতে সবেমাত্র প্রত্যাগত সতীন্দ্র যখন আপনার শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিল—তখন সুধীর কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রিত পুত্রের সেই রোদনারক্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল! পুত্রকে বক্ষে লইয়া সতীন্দ্র বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল!

সেই গৃহ তেমনই আছে! কেবল গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী—তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব নিরুপমা—চিরদিনের মত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে! সত্যই কি নিরুপমা নাই? সত্যই কি সতীন্দ্র স্বহস্তে তাহার স্বর্ণ-প্রতিমা ভস্ম-করিয়া আসিয়াছে? সতীন্দ্র কি স্বপ্ন দেখে নাই? না—না—অতি-নিষ্ঠুর দৃশ্য—অতি সত্য! তখনও আল্‌নায় নিরুপমার স্বহস্তে "কোঁচানো"

সাড়ীগুলি —টেবিলের উপর রৌপ্যময় ফুলদানিতে কৃত্রিম ফুলের তোড়া—আল্‌মারিতে তাহার সখের জিনিষগুলি তেমনই ভাবেই শোভা পাইতেছে! বিছানায় তেমনই ভাবে—তাহার কবরী-সিক্ত তৈলের স্নিগ্ধ গন্ধ মৃদু সৌরভে সতীন্দ্রের চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পূর্ণিমার রাত্রি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না লইয়া—তাহার শয়ন-কক্ষে অবাধে প্রবেশ করিয়াছিল! বাগানের ফুলের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া—বায়ু তেমনই বহিতেছিল! সব-ই আছে—শুধু সে-ই নাই!

বিছানার উপর একরাশি চামেলী ফুলের মত শুভ্র সুন্দর শিশু নিদ্রিত! শুধু তাহার নিদ্রিত মুখখানির দিকে চাহিয়া দুইটি স্নেহ-চঞ্চল চক্ষু ও একখানি হাস্য-প্রফুল্ল মুখ—তাহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছে না! কোথায় তুমি নিরুপমা—একবার ফিরিয়া এস,—একবার তেমনি করিয়া হাসিয়া বল, "এই যে আমি!" সতীন্দ্র আর সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু সময়ে সকলই হ্রাস হয়, শোক কিছু চিরকাল থাকে না, বিশেষতঃ পত্নীশোক! সতীন্দ্র আবার কায-কর্ম্মে মন দিল। কিন্তু তাহার দিবসের অধিকাংশ কাল সুধীরের সহিত খেলায় ও গল্পে কাটিত।

সে দিন কোন কাজে সতীন্দ্রকে গোপালনগর যাইতে হয়। বর্ষার গঙ্গা তাহার গৈরিক জলরাশিতে কূলে কূলে ভারিয়া উঠিয়াছিল। একখানা 'বোঝাই' নৌকা পাল তুলিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছিল। মাঝীরা সুর করিয়া "ও মন বেয়ে যাওরে আমার মনের নাও,—পবনের উলটা বেয়ে যাও রে" ইত্যাদি তাললয়হীন সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল। জলের ধারে শিকড় বাহির-করা বৃহৎ ডুমুর গাছের উপর বসিয়া একটা "চোক গেল" পাখী অবিশ্রান্ত চীৎকারে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকে

সজাগ করিয়া তুলিতেছিল। তখন পরপারে বৃষ্টি-বিধৌত ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন। তাঁহার রক্তিম চঞ্চল রশ্মি জলতরঙ্গের উপর নৃত্য করিতেছিল। আর জলের ধারে দাঁড়াইয়া একটি অচঞ্চলা বালিকা তাহাই দেখিতেছিল। বালিকা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীতা। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে, অনিন্দনীয় মুখশ্রীতে, পরিপূর্ণ অঙ্গাবয়বে এমনই একটা স্নিগ্ধ লালিত্য ছিল, যাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না, পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়! তীরে ঘাসের উপর একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস সূর্য্যালোকে তাহার নিপুণ হস্তের পরিচ্ছন্নতার সাক্ষীস্বরূপ সুবর্ণ-দীপ্তি প্রকাশ করিতেছিল।

নৌকা হইতে নামিয়া সতীন্দ্র চিনিতে পারিল, সেই বালিকা পুরোহিত-কন্যা মালতী। মালতীকে সতীন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই জানিত। কিন্তু আজ এই নির্জ্জন নদীতীরে, অস্তগামী সূর্য্যালোকে, সিক্তবসনা নিরাভরণা যৌবনাগতা কিশোরীকে দেখিয়া তাহার নূতন করিয়া মনে হইল, "মালতী কি সুন্দর!" ডুবিবার পূর্ব্বে সূর্য্য তাঁহার সবটুকু কিরণ, মালতীর লজ্জানত মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল। মুগ্ধ সতীন্দ্র দেখিল, কি সুন্দর!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার বিবাহ-বিরোধী সতীন্দ্র যখন স্বেচ্ছায় মালতীকে বিবাহ করিতে চাহিল,—তখন "গরিবের ঘর" বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কোনও আপত্তি করিলেন না। সতীন্দ্রের পুনরায় "সংসারী" হইবার সংকল্পে অনেকেই মনের সহিত হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও মুখে বলিলেন, "আহা—তা' হোক্—হোক্।"

কথাটা যখন সকলেই শুনিল—তখন সুধীরেরও শুনিতে বাকি রহিল না। পিতার বিবাহের অর্থটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। বিবাহের নামে— আলো, বাজনা, ফুলের ঝাড় এবং রোসনচৌকির বাদ্যের সহিত সুসজ্জিত পিতৃমূর্ত্তিই তাহার মনে হইল। সম্প্রতি তাহার এক পিতৃব্যপুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরবেশী পিতৃমূর্ত্তি কল্পনায় বড় মানাইল না, তথাপি সে হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "মধু, আমিও বিয়ে কর্‌তে যাব।" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার এই স্বার্থপরতায় পাছে মধু মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমিও যাবে, আমরা দু'জনে যাব।" কিন্তু আবার বিবাহার্থী মধুর মলিন বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "তোমার ভাল কাপড় নেই। বাবাকে বল্‌বো তোমায় ভাল রাঙা কাপড় আর জরীর টুপী কিনে দেবে।" মধু চৌধুরী বাড়ির বহু পুরাতন ভৃত্য এবং সুধীরের একান্ত প্রিয়তম সঙ্গী। অবশেষে মধু যখন জানাইল, "বিয়ে করে বাবা টুক্‌টুকে নতুন মা আন্‌বে!" তখন মুহূর্ত্তে তাহার হাসিখুসি ফুরাইয়া গেল; মুখমণ্ডল গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। "নতুন মা'র" কথায় তাহার স্বর্গগতা জননীর স্নেহমণ্ডিত মুখচ্ছবি মনে পড়িল।

অপরাহ্নে বেশভূষা সারিয়া সেণ্টে রুমাল ভিজাইয়া সতীন্দ্র যখন আপনাকে সান্ধ্য ভ্রমণের উপযোগী করিয়া লইতেছিলেন, তখন সহসা সুধীর আসিয়া ভজনসিং তেওয়ারির নামে অভিযোগ করিল। তেওয়ারী দেউড়ির দ্বারবান। বালকের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও আর্দ্র চক্ষুপল্লব তখনও রোদন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। সে আসিয়াই বলিল, "বাবা, তেওয়ারী বড় মিথ্যা কথা কয় না বাবা ?" সতীন্দ্র যদিও তেওয়ারির মিথ্যাভাষিতার পূর্ব্বে বিশেষ কোন প্রমাণ পান নাই, তথাপি পুত্রের সন্তোষের জন্য বলিলেন, "সে ভারি দুষ্ট—তাকে আর লাঠী খেল্‌তে দেব না—তা'হলেই খুব জব্দ হয়ে যাবে!" তেওয়ারির এই কঠিন শাস্তি সুধীরের মনঃপূত হইল ; সে চক্ষু মুদিয়া বলিল, "বাবা, তেয়ারী বলে তুমি 'নূতন মা' আন্‌বে। তেওয়ারী ভারি মিথ্যা কয়। মিথ্যে বল্‌লে পাপ হয়, না বাবা ?" পরক্ষণেই পিতার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "বাবা আমি 'নূতন মা' নেব না—আমি মার কাছে যাব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিন বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছে। শ্রাবণের আকাশে খণ্ড মেঘের অন্তরাল দিয়া সপ্তমীর চাঁদ সতীন্দ্রের বাতায়ন নিম্নে খর্জ্জুর গাছের মাথার উপর উদিত হইয়াছেন! খোলা জানালার সূক্ষ্ম 'নেটের' পর্দ্দা আন্দোলিত করিয়া বর্ষার বাতাস শেফালিকার গন্ধ বহন করিয়া অবাধে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। বেহারা ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই। বৃষ্টির জন্য মক্কেল ও বন্ধু-বান্ধব কেহই জুটিতে পারেন নাই। সতীন্দ্র আপনার নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়াছিল—ভাবিবার জন্য। সতীন্দ্র কি ভাবিতেছিল বলা কঠিন, কারণ সে এক বিষয় ভাবে নাই। সহস্র চিন্তার মধ্যে—সহস্র চিন্তাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া—সেই আর্দ্রবসনা সুন্দরীর মানসী মূর্ত্তি যে তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "খোকা বাবুর বড় অসুখ"—কর্ত্তা বাবু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। সতীন্দ্রের মোহের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন,—তাঁহার মনে হইল, এ কয়দিন সে তাহার নিকট বড় আসে নাই। যাহার আহার, নিদ্রা, খেলা, পিতা ভিন্ন সম্পন্ন হইত না, সে কেমন করিয়া পিতাকে ছাড়িয়া রহিয়াছে? সতীন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না যে, কি কুহকে তিনি পুত্রকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃগর্ব্বে আঘাত লাগিল, মনে হইল বালকের ক্ষুব্ধ হৃদয় ইতিমধ্যেই পিতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সহর হইতে ডাক্তার আনিতে লোক গিয়াছে,—সুধীরের কলেরা হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন সতীন্দ্র পুত্রের মাথার কাছে বসিয়া কাটাইয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন—"বিশেষ ভয়ের কারণ আছে, রোগ কঠিন।"

দারুণ তৃষ্ণায় বালক ক্রমাগত 'জল', 'জল' করিয়া একটু পূর্ব্বে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোগশীর্ণ মুখে ঈষৎ শান্ত জ্যোতিঃ প্রকাশিত! নিবিড় পক্ষ্মাচ্ছাদিত কৃষ্ণতারা চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ নিমীলিত! রোগের যন্ত্রণায় বালক যখন "মা-মা" বলিয়া ডাকিতেছিল—তখন সতীন্দ্রের দুই চক্ষু ফাটিয়া শোণিততুল্য তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও বালক বার বার বলিয়াছে, "বাবা—আমি 'নতুন মা' নেব না!"—এখন সতীন্দ্রের কাণের ভিতর—প্রাণের ভিতর বাজিতেছিল, "বাবা—আমি 'নতুন মা' নেব না!" না না সুধীর! তোমার 'নূতন মা' লইয়া কাজ নাই! সতীন্দ্রের মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! অদূরে ডাক্তার সাহেব ঔষধের খালি শিশি লইয়া উদ্বিগ্নভাবে নাড়িতেছিলেন। সতীন্দ্র জানিত না যে প্রথমবার ভেদের সহিত সুধীরের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। তাই পুত্রকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া তাহার চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মনুষ্য-বুদ্ধির অনধিগম্য যে বিপুল কারণরাশি কার্য্য করিতেছে—তাহার প্রতিবিধান কে করিবে? নিভিবার পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে,—সুধীরের নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনদীপও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তন্দ্রা-ত্যাগে বালক পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"বাবা—আমি মা'র কাছে যাই, মা আমাকে ডাক্‌চে! সেখানে কত ফুল, কত আলো, কত কি আছে। তুমি যাবে না বাবা?" বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া সুধীর চুপ করিল।

শ্রাবণের অকাল-সন্ধ্যা যখন চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল—দূরে গোপাল জীউর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দ স্তব্ধ সন্ধ্যাকে

সজাগ করিয়া তুলিতেছিল —ঠিক সেই সময়টিতে সুধীরের সমস্ত রোগ-যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল! তাহার পুষ্পপুটতুল্য সুন্দর মুখে একটি শান্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল! মাতৃক্রোড়চ্যুত শিশু বুঝি মায়ের কোলেই ফিরিয়া গেল।

শাস্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিশোরীলালের বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু পেটে তাহার বিদ্যার যেটুকু সংস্থান হইয়াছিল, সাধারণতঃ ভদ্রগৃহস্থ গৃহের পাঁচ বৎসরের ছেলেরও প্রায় ততটুকুই হয়। শ্যামলালের বন্ধুবর্গ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় পিতার এই অন্যায় ঔদাসিন্যকে এমনি প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে, অনেকটাই তাহাদের রসনার তীক্ষ্ণ ঘায়ে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে শ্যামলাল তাহাদেরই যুক্তির নিকটে নিজের অপরাজিত স্নেহকেও থর্ব্বতা স্বীকার করাইতে বাধ্য হইল। অবশ্য ইহার মধ্যে তাহার নিজেরও হয় ত কোন গূঢ় অভিসন্ধিরও যোগ থাকিতে পারে।

প্রথমে বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষকালে একদিন তাহাকে বোর্ডিংএতেই পাঠান স্থির হইয়া গেল। পিতার অনেক সাধ্যসাধনায় যখন কিশোরীকে সম্মত করা গেল না, তখন একদিন কিং জর্জ্জ ইন্ষ্টিটিউটের কর্ত্তাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া শ্যামলাল তাহার হস্তেই ছেলে সঁপিয়া দিলেন। কিশোরী কিছুতেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না, বিস্তর উপদেশ আদর ও ভর্ৎসনার পর ধৈর্য্যচ্যুত শিক্ষক মহাশয় উঠিয়া আসিয়া কিশোরীর হস্ত ধরিলেন। কিশোরী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল ; রাগে, অভিমানে, অপমানে

তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। শিক্ষক মহাশয় দুরন্ত ছেলে বশ করা-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ; তিনি বজ্রমুষ্টিতে কিশোরীলালকে ধরিয়া গাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন।

কিশোরীলাল গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "না—আমি যাব না।" কিন্তু যখন দেখিল, তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন জোর জবরদস্তি সকলই বিফল হইল, তখন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং "না আমি যাব না" এই একমাত্র কথা বলিতে বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিশোরীলালের অভাব শ্যামলালকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল; বার বৎসরকাল যে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল হয় নাই, আজ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধের হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। খাইতে বসিতে শুইতে পদে পদে তাহার প্রাণটার ভিতর একটা মহাশূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও কিশোরীলালকে দূরে পাঠাইয়া তাহার যেন একটু সোয়াস্তি হইল।

একটা ব্যবসায়ে বৃদ্ধের অনেক টাকা লোকসান হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে কিছু দেনাও হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, কিরূপে সে দেনা পরিশোধ করিবে। একটা পাপ কল্পনা দুই একবার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু কিশোরীলালের জন্য সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এখন কিশোরীলাল ' নাই। সে কল্পনাটা আবার জোর করিয়া তাহার মনটা অধিকার করিয়া বসিল। দোকান-ঘরখানা মায় আসবাবপত্র অনেক টাকায় বীমা করা ছিল; শ্যামলালের দেনার জন্য পূর্ব্বেই দোকানের অনেকটা অবনতি হইয়াছিল; এখন যত টাকার বীমা করা ছিল, দোকানের জিনিসপত্র সব বিক্রয় করিলেও তাহার সিকি টাকাও উঠিত কিনা সন্দেহ। তাই শ্যামলাল ঠিক করিল, দোকানের বহুমূল্য দ্রব্যাদি অন্যত্র সরাইয়া ফেলিয়া জিনিস পত্র সমেত দোকান ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে: শ্যামলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া, :দোকানে আগুন লাগানই

স্থির করিল। পুত্র নিকটে নাই ; বাড়ীর যে একটি ঠিকা দাসী ছিল, দশটা বেলার মধ্যে কাজকর্ম্ম সারিয়া সে চলিয়া গেল। শ্যামলালও নিজের কার্য্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দোকানের ভিতর হইতে দ্বিতলে যাইবার কাঠের সিঁড়িটার উপর মোটা কার্পেট মোড়া ছিল, শ্যামলাল কেরোসিন তৈল দিয়া সিঁড়ির কাষ্ঠ ও কার্পেটখানা উত্তমরূপে ভিজাইল। দোকানের মেজেতে যে ম্যাটীং ছিল, তাহাতেও কেরোসিন ঢালিল। চেয়ার টেবিলের কাঠে, ছবির ফ্রেমে, আলমারীর ভিতর বেশ করিয়া কেরোসিন ও তার্পিন মাখাইল। টুকরা টুকরা কাপড় কেরোসিনে ভিজাইয়া সকল জিনিসের সহিত যোগ করিয়া দিল। একটা কোন স্থানে আগুন ধরিলেই, যাহাতে একসঙ্গে সকল যায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠে, এ ব্যবস্থাটী কেবল সেইজন্যই হইল। বেলা প্রায় ৪টা ৫টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া শ্যামলাল হাঁপ ছাড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের দোকানে প্রত্যহই একটী ছোটখাটো সভা হইত। দোকানের সম্মুখে তিন চারি খানি বেঞ্চে বসিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক ধূমপান ও নানা বিষয়িণী বক্তৃতায় সময় নষ্ট করিত। সেদিনও যথাসময়ে একে একে পাঁচ সাতটী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামলালের চঞ্চল দৃষ্টি, অন্য-মনস্ক ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করিল, বৃদ্ধ পুত্রের চিন্তায় এরূপ করিতেছে। সেইজন্য তাহাকে বড় একটা কেহ বিরক্ত করিল না ; নিজেরাই পাঁচ রকম কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল। শ্যামলালের প্রতিমুহূর্ত্ত যুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছিল! যে বন্ধুরা একদিন আসিতে বিলম্ব করিলে তাহার মনে দুঃখ হইত, আজ

তাহারা এখনও যাইতেছে না বলিয়া সে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে সকলেই উঠিয়া গেল।

হরেন্দ্র বাবু শ্যামলালের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; তিনি চুরুট ধরাইবার নিমিত্ত পকেটে দেশালাই খুঁজিয়া না পাইয়া শ্যামলালকে একবার দেশালাইটা দিতে বলিলেন।

শ্যামলাল দোকানের ভিতর দেশলাই আনিতে গেল; তাহার বন্ধুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দোকানে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ফাঁকা হাওয়ায় তাঁহারা কেহই তার্পিন বা কোরোসিনের গন্ধ পান নাই। কিন্তু দোকানে ঢুকিতেই হরেন্দ্র বাবুর নাসারন্ধ্র কেরোসিনের তীব্র গন্ধে জ্বলিয়া গেল। তিনি নাসিকায় বস্ত্রাবৃত করিয়া বলিলেন, "কি হে শ্যামলাল, এ বিকট গন্ধ কোথা থেকে আস্‌ছে? তোমার এত বড় মণিহারীর দোকান, এতে কোথা আতর গোলাপ সেণ্ট মেণ্টের গন্ধে ভর ভর কর্‌বে, না কেরোসিন তার্পিনের ঝাঁজে নাক জ্বলে গ্যাল যে, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

প্রশ্ন শুনিয়া শ্যামলালের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল, মুখখানা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, সহসা মুখে কোন কথা বাহির হইল না। অনেক কষ্টে একটু সামলাইয়া শ্যামলাল বলিল, "ল্যাম্পে তেল ঢালিবার সময়, চাকর ব্যাটা একটিন কেরোসিন ফেলে দিয়েছে। ম্যাটিং কাগজপত্র সব ভিজে মাটি হয়ে গ্যাছে। কি কর্‌ব বল, যা হয়েছে তাতে আমার ত ভয়ে প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কোথাও একবিন্দু আগুন ধরলে আজ আর রক্ষা থাকবে না।"

হরেন্দ্র বাবু আলোটালো সাবধানে রাখিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।—এ সময় সকলেরই নিদ্রার কোলে শায়িত থাকাই নিয়ম।

কিন্তু তাহা হইতেছে না। পথ লোকে লোকারণ্য, শ্যামলালের দোকান ঘরে আগুন লাগিয়াছে। একে কাঠের ঘর, তাহাতে দক্ষিণা বাতাস পাইয়া আগুণ হু' হু' শব্দে জ্বলিতেছে। পথের লোক নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। অগ্নির নিকট যায় কাহার সাধ্য? পার্শ্ববর্ত্তী গৃহগুলি যাহাতে রক্ষা হয়, সকলেই সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির অনতিদূরে বৃদ্ধ শ্যামলাল দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে ও দুই হস্তে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। তাহার এই সর্ব্বনাশে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছে, অনেকেই সান্ত্বনা করিতেছে, কিন্তু শ্যামলাল কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। অগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর লোকের ব্যস্ততা ও পথের লোকের কোলাহলে সে স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। সহসা সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উপস্থিত সকলেই ভীত, স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শ্যামলালের আর্ত্তনাদও থামিয়া গেল! তাহার সেই স্তিমিত নেত্র যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। প্রজ্জ্বলিত দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে কে চিরপরিচিত, ভীত, আকুলস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা!"

শ্যামলাল সেই স্বরে বজ্রাহতের ন্যায় উপরে চাহিয়া দেখিল; সেই

সঙ্গে উপস্থিত সকলেই চাহিয়া দেখিল, অর্দ্ধ জ্বলিত বারান্দায় নগ্নপদে, নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া--শ্যামলালের নয়নের জ্যোতি, বার্দ্ধক্যের ভরসা, জীবনের সম্বল কিশোরীলাল। বালক আকুল স্বরে ডাকিতেছে, "বাবা!"

শ্যামলাল প্রথমে কেমন হইয়া গেল, পরক্ষণেই একটা বিকট চীৎকার করিয়া, কেহ বাধা দিবার পূর্ব্বেই, সেই প্রজ্বলিত অনল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। বৃদ্ধ সামর্থ্যহীন শ্যামলালের বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর বল আসিল। সেই অগ্নি ও ধূমাচ্ছন্ন দোকান ঘরের ভিতর গিয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের শ্বাসরোধ না হইতে দিয়া, শ্যামলাল কাঠের সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিল। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া সেই স্তূপাকৃতি, জ্বলন্ত, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠরাশি ভেদ করিয়া দ্বিতলের যে কক্ষের বারাণ্ডায় কিশোরী-লালকে দেখিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরখানি ধূমে আচ্ছন্ন; বৃদ্ধ আর বুঝি পারিল না। দুইবার তাহার দম বন্ধ হইবার মত হইল, তবু সে অসীম মানসিক বলে কোন গতিকে সেই ঘর পার হইয়া যে বারান্দায় কিশোরী ছিল, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নিতাপে বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও হয়। "বাবা কিশোরী, আমি এই যে!"

বলিয়া বৃদ্ধ দুই হস্ত প্রসারণ করিল। অর্দ্ধদগ্ধ, অর্দ্ধজ্ঞানশূন্য কিশোরী পিতৃকোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামলাল সজোরে কিশোরীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, সেই অর্দ্ধ অন্ধকারে অর্দ্ধ আলোকে, আন্দাজে আন্দাজে দরজা পার হইয়া সিঁড়িতে আসিল। অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নীচে নামিতে লাগিল। অর্দ্ধপথে একখানা প্রজ্বলিত বরগা ছাদ হইতে খসিয়া শ্যামলালের মাথায় পড়িল, মাথাটা কাটিয়া ভয়ঙ্কর বেগে

রক্ত পড়িতে লাগিল; শ্যামলাল কিশোরীকে আরও জোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নামিতে লাগিল। আর ২।৩ ধাপ নামিলেই দোকানের দরজার কাছে যাওয়া যায়, এমন সময়ে ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত সিঁড়ি পড়িয়া গেল; বাহিরের লোকেরা বাতুল শ্যামলালের কার্য্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছিল; সোপান পতনের ভীষণ শব্দে তাহারা বুঝিল, শ্যামলাল কিশোরীর আজ প্রজ্বলিত অনলে সমাহিত হইল। কিন্তু প্রায় দুই মিনিট পরে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ, বীভৎস মূর্ত্তি শ্যামলাল, কিশোরীলালকে বক্ষে লইয়া সেই অগ্নি-সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিল।

শ্যামলাল, কিশোরীলালকে পথের মধ্যে শোয়াইয়া দিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। তাহার সেই দগ্ধমুখে একটী প্রীতির ভাব প্রকাশ পাইল। "ভগবান্! তোমার সূক্ষ্ম বিচারের তুলনা নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে,"—বলিতে বলিতে শ্যামলাল চিরদিনের মত চক্ষু মুদিল।

বহুকষ্টে কিশোরীলালকে শ্যামলালের প্রতিবেশীরা বাঁচাইল। সেই অগ্নিকাণ্ডের দিন সন্ধ্যার সময় কিশোরী স্কুল হইতে পলাইয়া আসিয়া খিড়্‌কির দরজা দিয়া চুপে চুপে নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়াছিল, শ্যামলাল জানিত না যে, কিশোরীলাল রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে; কিন্তু শ্যামলাল না জানিলেও একজনের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহার পাপ-কার্য্য গোপন ছিল না, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধের পূর্ব্বেই শাস্তিও তাহার স্থির হইয়া গিয়াছিল।

রমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। আমর বয়স তখন তের চৌদ্দ হইবে, সেই সময়েরই সেই ভুল। আমাদের বাড়ি পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রাম বলিয়া ভীত হইবার কোন কারণ নাই। গ্রামখানি ভাল, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় মধুর শান্তিময়। আর আমার বাল্যের ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুও বড় মধুর শান্তিময় ছিল। শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি, কলনাদিনী ময়ূরাক্ষি আর অস্তাগমনোন্মুখ রৌদ্রালোকে উদ্‌ভাসিত তীরভূমি আমাদের বড় আদরের স্থান ছিল। অবশ্য এর মধ্যে কবিত্ব কিছু থাকিতেও পারে, কিন্তু কবিত্ব বোধের পূর্ব্বাবধিই এদের অমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম।

আমাদের বাড়ির পাশেই বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি। বাণীকণ্ঠ বড় অমায়িক সরল প্রকৃতির লোক। তাঁহাদের সহিত আমাদের বাড়ির সকলেরই অতিশয় সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা আমার বাল্যাবধিই সকলেই আমায় 'জামাই, জামাই' বলিতেন। কেন কে জানে তাতে আমার বড় আনন্দ হইত। বাণীকণ্ঠ ও বাড়ির মেয়েরা সকলেই আমায় ভালবাসিত। আর সকলের উপর রমা। রমা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ক্ষুদ্র বালিকা রমা যথার্থই আমায় বড় ভালবাসিত। আমিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম, একদণ্ডও প্রায় কাছছাড়া হইতাম না। যদি দৈবাৎ রমাদের বাড়ি না যাইতে পারিতাম, রমা

বড়ই দুঃখিত হইত। পরদিন যথাসময়ে উপস্থিত হইলে রমা তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতায় কিছুই বলিতে পারিত না, শুধু তাহার ঘন পক্ষচ্ছায়া-বেষ্টিত বিশাল চক্ষের ঈষৎ অভিমান অনুযোগের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, অপ্রতিভ হইয়া আমি মাথা নিচু করিতাম। আবার আমি ক্ষমা চাহিলেও সে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িত। আমায় অনেকেই 'রমার বর' বলিত। আমার কিন্তু তাহাতে একটু কেমন আত্মপ্রসাদের ভাবই মনে আসিত। আর রমা?—রমা সর্ব্বদাই ত্রস্ত ভীত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, যেন সে কতই অপরাধী। সময় সময় তাহার বড় বড় চোখদুটী জলে ভরিয়া আসিত, আমায় দেখিলেই রমা বড় বিভ্রাটে পড়িত, কোথায় লুকাইবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইত না। কিন্তু আমি জানি, আমায় না দেখিয়া, আমার কাছে না আসিয়াও রমা থাকিতে পারিত না।

একদিন সন্ধ্যার পর রমা তাহাদের দাওয়ায় বসিয়া তাহার ছোট ভাইটীকে আদর করিতেছিল এবং সুবোধের ক্ষুদ্র হস্তে কল্পিত চাঁদ ধরিয়া দিতেছিল। সুবোধ কিন্তু নিতান্ত অবোধের মত হাত পা ছুঁড়িয়া ইহাতে বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল এবং আপনার ক্ষুদ্র বাহু দিয়া চাঁদ ধরিবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছিল ও মধ্যে মধ্যে তাহার দিদির চুলের গোছা ধরিয়া টান দিতেছিল। রমা ঈষৎ হাসি—ঈষৎ রাগের সহিত 'দুষ্টুছেলে' বলিয়া চুল ছাড়াইয়া লইতেছিল। বাড়িতে তখন কেহই ছিল না। রমার মা পুকুরে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। আমায় দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বসিতে মাদুর আনিয়া দিল। আসন গ্রহণ করিয়া দুজনে অনেকক্ষণই নীরব রহিলাম। দুজনেই বড় হইতেছি, কথা এখন আর তেমন করিয়া কহা যায় না। এক সময় হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম,

"আচ্ছা রমা, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় তাহ'লে কেমন হয় ?"

কথাগুলা বলিয়াই বড় লজ্জিত হইলাম, কারণ মনে যাই হউক, এসব কথা তাহাকে এরূপভাবে বলিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই অপ্রতিভভাবে রমার দিকে চাহিলাম। বিবাহের নামেই লজ্জায় রমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই মুক্তার মত স্বচ্ছ দুই ফোঁটা অশ্রুজল তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পরিল, সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে রমা বলিল, "তুমি শুদ্ধ আমায় ঠাট্টা কর শিরিশ দাদা ?"

বোধ হইল এ বালিকা স্বপ্নেও আমার কাছে এমন কথার প্রত্যাশা করে নাই। লজ্জা ক্রোধ অভিমানে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রমার সেই সলজ্জ করুণশ্রী কি সুন্দর! রমার জন্য আমি যে সব করিতে পারি। আমি সাগ্রহে বলিলাম, "না, না রমা, আর আমি অমন কথা বলে তোমার মনে কখনই কষ্ট দেবো না। তুমি আমার ছোট বোন, আমি তোমার দাদা, কেমন রমা ?"

বড় মধুর স্নেহ-কোমল স্বরে রমা বলিল, "হ্যাঁ, আমিও তোমার কাছে আস্‌তে আর কখন লজ্জা করবো না।"

বলিতে বলিতে বালিকা মস্তক নত করিয়া আমার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

উপরে বিস্তৃত নীলাকাশ, নিম্নে বিশাল পৃথী, হতভাগ্যের সে বাল্য-প্রতিজ্ঞা বোধ করি কাণে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অক্ষয় মসীতে লিখিয়া রাখিলেন।

সেই হইতে রমা আর আমায় লজ্জা করে না। প্রত্যহ আমার কাছে পড়া লইতে আসে। দুইজনে আমার ক্ষুদ্র উদ্যানটী সযত্নে পরিষ্কার করি; স্বহস্তে রমাকে আমার গাছের ফুল তুলিয়া দিই। আমার স্বহস্ত-রোপিত গোলাপ গাছের গোলাপ ফুলে তাহাকে আরও কত সুন্দর দেখায়! অবসর পাইলেই নদীতটে তৃণশয্যায় বসিয়া কত আশ্চর্য্য অদ্ভুত গল্পে তাহাকে বিস্মিত চমকিত করিয়া দিই। সরল আগ্রহে রমা আমার প্রত্যেক কথা বেদবাক্যের মতই মানিয়া লইত। গল্প শেষ হইয়া গেলেও রমা নির্নিমেষ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া কখনও গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিত! কে জানে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কিসের বেদনা বাজিত! কে জানে সে কি ভাবিত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমনই সুখে আরও কয়টা বৎসর কাটিয়া গেল। আমার নির্ম্মল অদৃষ্ট গগনে ধীরে ধীরে কাল মেঘ দেখা দিল। রমা এখন বারো বৎসর পার হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমাদের ক্ষুদ্র রমা বিবাহের বয়স ছাড়াইতে চলিয়াছে। এখনও মনে হয় সেদিন! হিন্দুর ঘরে অত বড় মেয়ে আর ত রাখা যায় না! রমার জননীর ইচ্ছা আমাকেই রমা দান করেন। বাণীকণ্ঠ নাকি আমি দরিদ্র বলিয়া প্রথমে একটু ইতস্তত: করিয়াছিলেন, শেষে পত্নীর মতেই মত দিলেন, যা একটু সংশয়—একটু ভাবনা ছিল, তাহাও গেল। রমা—প্রেমময়ী স্নেহময়ী রমা আমারই। রমার সহিত আমার বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। মাস ছয়ের মধ্যেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হতভাগ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। সে কথাটা এই—

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যবন্ধু বহুদিন পশ্চিমে ছিলেন। সম্প্রতি পেন্‌সন্ লইয়া দেশে আসিয়াছেন। কিশোরী বাবু দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক। তাঁহার একমাত্র পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র। ক্ষীরোদ বড় ভাল ছেলে, এবৎসর এম-এ পাশ করিয়া সে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পড়িতেছে। দেখিতেও বড় সুন্দর রমণীমোহন। স্বভাবেও ক্ষীরোদকে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। একবাক্যে সকলেই বলিত, ক্ষীরোদের মত ছেলে দ্বিতীয় নাই। সত্যের অনুরোধে আমিও স্বীকার করি, বাস্তবিকই ক্ষীরোদের মত ধীর বিনয়ী স্নেহময় লোকবৎসল আমি প্রায় দেখি নাই।

বিদ্যার গৌরব বা অহঙ্কার ক্ষীরোদের দিক দিয়াই যাইত না। ক্ষীরোদকে বন্ধুরূপে পাইয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবানই ভাবিয়াছিলাম। হায়! তখন যদি জানিতাম যে, আমি আপনার পায়ে আপনি স্বহস্তে কুঠারাঘাত করিলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটী রবিবারে আমি ক্ষীরোদকে লইয়া রমাদের বাড়ি গেলাম। রমার মা আমাদের দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। ক্ষীরোদের রূপগুণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ক্ষীরোদের প্রশংসায় আমার বড়ই আনন্দ হইল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। এই সময় রমার সব ছোট ভাই সুশীল তাম্বুলরাগে আবক্ষ রঞ্জিত করিয়া আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিল। ক্ষীরোদকে দেখিয়াই বালক থমকিয়া দাঁড়াইল ও তাহার বড় বড় কালো চোখের উজ্জ্বল সকৌতুক সরল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। সুশীলের চোখ ঠিক রমার মত। সেই জন্যই কি কেন বলিতে পারি না, আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। আমি আদর করিয়া ডাকিলাম, "এস না সুশীল,কাছে এস।"

বালক উত্তর দিল না, নড়িলও না।

এবার ক্ষীরোদের পালা। কি আশ্চর্য্য! ক্ষীরোদ একবার মাত্র ডাকিতেই যেন চিরকালের পরিচিতের মতই বালক একেবারে তাহার কোলে গিয়া উঠিয়া বসিল।

ক্ষীরোদ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?" সুশীল বিশেষভাবে এবার আঙ্গুলদুটি মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, "ছুছিল।"

ক্ষীরোদ বলিল, "তুমি পড়তে জান?"

বালক সে কথাটার উত্তর দেওয়া বড় প্রয়োজনীয় বোধ করিল না, বলিল, "তুমি আঙা দিদিল্ বল্।"

ক্ষীরোদ ঈষৎ বিদ্রূপ মাখা হাসি হাসিয়াই একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না আমি তোমার দাদা।"

সুশীল অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িল। আমরা দুজনেই হাসিলাম।

বালক এবার আপত্তিপূর্ণ স্বরে ধমক দিয়া বলিল, "না তুমি বল্।" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অদূরোপবিষ্ট বিড়াল শিশুটির উপর মনোযোগ দিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বিদায় লইয়া বাড়ির বাহির হইলাম। একবার রমাকে দেখিয়া যাইতে বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লজ্জার অনুরোধে সে আশা সফল হইল না। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া পর্য্যন্ত রমা আর আমার সম্মুখে বাহির হয় না। যাই হউক মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া আমরা বাহির হইলাম। যাইবার সময় বাগানের পথ দিয়াই চলিলাম। বাগানের উপরেই রমার ঘর। সহসা বাতায়নে দৃষ্টি পড়িল। কি দেখিলাম!—বাতায়নে হস্ত রাখিয়া নতদৃষ্টিতে রমা দাঁড়াইয়া আছে। রমার সেই সুকুমার সৌন্দর্য্য কৈশোরের অপূর্ব্ব শোভায় আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই সুবিস্তৃত নেত্রযুগল, সুকুমার মুখাবয়ব, চরণ-চুম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ ঘন কেশরাশি অগ্রভাগে ঈষৎ কুঞ্চিত। কোমলমৃ ণালনিভ বাহুলতা আর সর্ব্ব সমেত কি একটি মধুর সকরুণ সৌন্দর্য্য, যাহা দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়,—সংসার ভুলিতে হয়।

ক্ষীরোদ বোধ হয় আমার ভাব দেখিয়াই বিস্মিতভাবে উপরে চাহিল, কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

বাতাসে রমার গোলাপী কপোলে চূর্ণ কুন্তলদাম খেলা করিতেছিল। নীল বসনে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, ঠিক যেন ভাস্কর-

গঠিত প্রতিমার মত রমা দাঁড়াইয়াছিল। সহসা কিশোরী নত নেত্র উত্তোলন করিয়া চাহিল। প্রথমেই ক্ষীরোদের উপর সেই বিশাল চক্ষের বিপুল স্নেহমধুরতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টি পড়িল। নিমেষে চারিচক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। লজ্জিত হইয়া বন্ধুবর মস্তক নত করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দেবী প্রতিমা অন্তর্হিতা হইলেন, বাতায়ন রুদ্ধ হইল। ক্ষীরোদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শিরিশ, তুমিই যথার্থ ভাগ্যবান।"

আমি লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিলাম, হায়! তখন কেন বুঝিলাম না, কেন ভাবিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিনেই একটা বিশেষ কাজে পড়িয়া আমায় কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। আসিবার সময় কতকগুলি সৌখীন দ্রব্য, দু'একখানি গল্পের বই, একখানি পারিবারিক প্রবন্ধ, তিনভাগ সদালাপ ও কয়েকটী কেশ তৈল তাহার জন্য ক্রয় করিলাম।

একবার বড় অসুখ হইয়া রমার সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রমা কোন-মতেই আমার সম্মুখে বাহির হইত না, অনেক কষ্টে অনেক পীড়াপীড়ির পর এ অযথা লজ্জার কারণ আবিষ্কার করিয়া আমি তাহার কেশ বিরল মস্তকের দিকে চাহিয়া কোনমতেই হাসি রাখিতে পারি নাই। লজ্জায় রাগে অভিমানে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তাকে আদর করিয়া একটী বিখ্যাত কেশ তৈল উপহার দিয়াছিলাম। দুইমাসের পর মামার বাড়ি হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, আমার আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র রমা তাহার নবোদ্ভূত ঘন কৃষ্ণ সুবাসিত কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ছুটিয়া আসিল। মধুর কৃতজ্ঞতা বালিকার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই হইতে প্রায়ই আমি রমাকে সেই তৈল উপহার দি, রমাও বিশেষ আনন্দ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে।

এবারে বাড়ি গিয়াই বন্ধুবর ক্ষীরোদচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক মাসেই ক্ষীরোদের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, যেন কি একটী গভীর চিন্তা দিবারাত্রিই তাহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। আমি বলিলাম, "ভাই এভাব কেন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া (যেমন অমানিশায় বিদ্যুৎ চমকায়) বন্ধু বলিলেন,

"পরিবর্ত্তনশীল জগতে এটা কি এতই আশ্চর্য্য মনে কর?" কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল না, চুপ করিয়া রহিলাম।

সেই দিন অপরাহ্নে বোসেদের বাগানে বেড়াইতে গেলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত নিশীথে চারিধারের সুমধুর সৌরভের মধ্যে থাকিয়াও আজ মনটা খারাপ হইয়া রহিল। কি যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। দূরে একজন পথিক গাহিয়া যাইতেছিল,—

"কেন গো ফিরালে আঁখি, কেন এত অভিমান?
ওগো কার অনাদরে ছল ছল দু'নয়ান!
কেনগো ফুটে না কথা, কেন এত ব্যাকুলতা,
কে দিয়েছে বুকে ব্যথা, কে করেছে অপমান?"

সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি বড় মধুর সুরে কাণে বাজিতেছিল, ক্ষীরোদের মুখের দিকে চাহিলাম, যেন আমার অন্তরের উচ্ছ্বাস বহন করিয়া বাজিতেছিল, 'ওগো কার অনাদরে ছল ছল দু'নয়ান।'

গান থামিয়া গেল, কিন্তু তখনও আমার কাণের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল, 'কেন গো ফুটেনা কথা, কেন এত ব্যাকুলতা, কে দিয়েছে বুকে ব্যথা, কে করেছে অপমান?' যেন আমার মনের কথা মনের ভাব গানের প্রত্যেক অক্ষরে ধ্বনিত হইতেছিল। বহুক্ষণের পর সেই অসহ্য নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষীরোদই আগে কথা কহিল, একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দু' একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন বলি বলি করিয়াই বলিতে পারিতেছিল না। আমার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িতেছিল। অত্যন্ত মানসিক আবেগে আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে দৃঢ়রূপে চাপিয়া

ধরিয়া ক্ষীরোদ বলিতে লাগিল, "শিরিশ, ভাই, তুমি আমায় ভালবাস, বিশ্বাস কর, প্রাণের বন্ধু ভাব, তা আমি জানি, কিন্তু ভাই! কখন ভেবেছ কি আমি তোমার সেই নিস্বার্থ ভালবাসা, অকৃত্রিম বন্ধুতার বিনিময়ে তোমারই বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েছি? আমি অকৃতজ্ঞ সেই সকল বিশ্বাসের ফলে গভীর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হয়েছি।"

ক্ষীরোদ থামিল। তাহার মুখ চোখ রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ, ঠিক যেন মরা মানুষের মুখের মতই দেখাইতেছিল। তেমন ম্লান, তেমন বিষণ্ণ মুখ আমি জীবনে কখন দেখি নাই, সেই আমার প্রথম আর সেই শেষ দেখা।

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'এসব কি কথা ক্ষীরোদ! তুমি কি পাগল হয়েচ?"

"না ভাই না, তুমি এখন জান না, তাই আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইতে পারছ। আগে শোন, তোমার বিশ্বাসী প্রিয় বন্ধু কিরূপে বন্ধুতা রক্ষা করেচে। তারপর যা বলবার বলো। সেই দিন সেই অভশুক্ষণে—অশুভ নয় কি? তাকে দেখে অবধি আমি পাগল হয়েছি। জানি না সে কি জানে! আমায় যেন কোন যাদুমন্ত্রে সে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে ভুলিবার জন্য অনেক দিন অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই! কতদিন তাহাকে দেখিবার আশায় তাদের বাড়ির সম্মুখে নানাছলে ভ্রমণ করিয়াছি, আবার তোমার কথা ভাবিয়া তখনই হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি ভালরূপেই জানিয়াছি, রমা তোমায় ভালবাসে। তবে কেন এ পবিত্র মিলনের অন্তরায়

হইব? বাবা নাকি একদিন রমার বাপকে আমার সহিত তাহার বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনিও তাহাতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। শিরিশ! মনে কর না আমি এত বড় স্বার্থপর! আমি বাবাকে প্রকারান্তরে জানাইয়াছি যে বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই। বাবার মত ত তুমি জানই। তিনি বাল্য-বিবাহের অত্যন্ত বিরোধী, তাই ভাবিয়াছি তোমাদের সুখেই সুখী হইতে চেষ্টা করিব। ভাবিয়াছিলাম এ কথা কখনও প্রকাশ করিব না, কিন্তু তোমার কাছে লুকাইতে পারিলাম না। হায় রমা! কেন তোমার ও বিশ্ববিপ্লাবনকারী রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, কেন এ হতভাগ্যের জীবন চিরদিনের জন্য শ্মশান করিয়া ছিলে! শিরিশ, বন্ধু, না না-তুমি আমায় ঘৃণা করিতেছ? আমি আর বন্ধু নামের যোগ্য নই। আমি আমার মনের কাছে ঘোর অবিশ্বাসী। ভাই, আমায় বিদায় দাও, কোন দূর রাজ্যে চলিয়া যাইব, সেখানে থা ... রমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব। নিকটে থা ... তাহা দেখিতে পারিব না জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও।"

মনের আবেগে একেবারে অনে ... বলিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে হাতের উপর মাথা রাখিয়া ক্ষীরোদ নীরব হইল। মিতভাষী বন্ধুর মুখে এত কথা একেবারে আমি কখনও শুনি নাই। আমিও নীরব! আশা, নিরাশা, সহানুভূতি, বিস্ময় প্রভৃতি সকল মনোভাবগুলা মিলিয়া আমায় এক প্রকার স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিল। কি শুনিলাম, কি দেখিলাম কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না। যেন স্বপ্নের মত সমস্ত ঘটনাটা মনে হইতে লাগিল। এসব কি সত্য হওয়া সম্ভব? কখনই নয়, যাহা মুহূর্তের জন্যও ভাবি নাই, জানি নাই, তাহাই এখন সত্য বলিয়া

জানিতে হইবে? সমস্ত ঘটনাটা যেন মাথায় আসিতেছিল না। অনেক-ক্ষণের পর যখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম ক্ষীরোদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তখনও চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, সুধু মধ্যে মধ্যে সুদূরাগত ময়ূরাক্ষীর কুলুকুলুরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। আর একবার নিশাচর পক্ষীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া যেন একটা হাহা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া একসঙ্গে উড়িয়া যাইতেছিল। চাঁদের আলো আরও উজ্জলরূপে ফুটিয়া-ছিল। অতি নিবিষ্টচিত্তে বন্ধুবর ক্ষীরোদচন্দ্র একটা সত্ত ছিন্ন গোলাপ ফুল নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "ক্ষীরোদ, তুমি কি রমাকে আর দেখিয়াছ?"

স্বভাবসিদ্ধ মৃদু মধুর স্নিগ্ধ হাসিতে শুষ্ক ওষ্ঠ ভেদ করিয়া তাহার মুক্তার মত শুভ্র দন্তাবলী ঈষৎ বিকশিত হইয়া উঠিল। বেশ সরল প্রশান্তভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বন্ধু বলিলেন "শিরিশ তুমি, কি মনে কর তোমার মত সকলেই রমার জন্য পাগল?"

আশ্চর্য্যভাবে ক্ষীরোদের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সরল স্নেহ-পূর্ণ মুখ—তাহাতে কি প্রতারণা থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা শুনিলাম সে কি ইন্দ্রজাল না স্বপ্ন! সেদিন যেমন শান্তিময় হৃদয় লইয়া বাহির হইয়া-ছিলাম, তেমনি গুরুভার বুকে লইয়া সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে বিষণ্ণ মুখে ঘরে ফিরিলাম। কে জানে পরে কি হইবে!

* * *

তারপর? তারপর কি আবার বলিয়া দিতে হইবে! তারপর ক্ষীরোদের সহিত শুভদিনে রমার বিবাহ হইয়া গেল। রূপে গুণে, কুলে

শীলে ক্ষীরোদের মত পাত্র দুর্লভ, এমন এম, এ, পি, আর, এস, ধনীর একমাত্র সন্তান ছাড়িয়া কে কবে ইচ্ছা করিয়া সামান্য একজন চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাষ্টারকে কন্যাদান করিতে চায় !

রমা নিজেও এ বিবাহে সুখী হইয়াছে। বিবাহ—সভার উজ্জ্বল আলোকমালায় তাহার আনন্দোজ্জ্বল ফুল্লারবিন্দের মত সুন্দর মুখখানিই আমার কথার সাক্ষ্য দিয়াছিল। কিন্তু সেজন্য আমি রমাকে দোষ দিতে পারি না। ক্ষীরোদের সেই কন্দর্প—বিনিন্দিত দেবদুর্ল্লভ রূপ চোখে দেখিয়া কত পুরুষেই মুগ্ধ বশীভূত হইয়াছে, রমা ত সামান্যা বালিকা, ভালবাসার সুধাময়ী স্নেহপ্রতিমা।

এ বিবাহে নাকি ক্ষীরোদ অনেক আপত্তি করিয়াছিল। শুধু কি বন্ধুত্বের অনুরোধে ? যদি তাই হয়, তবে ক্ষীরোদ, যথার্থই তুমি দেবতা ! আর রমা যথার্থই তুমি ভাগ্যবতী। তাই এমন দেবদুর্লভ স্বামী লাভ করিলে। আমার আজ আপনাকে সান্ত্বনা করিবার কথা আছে। আমার আদরের ধন রমা যে যোগ্য পাত্রে অর্পিতা হইল, বহুমূল্য মুক্তাহার য বানরের গলায় পড়িল না, ইহাই আজ আমার সম্পূর্ণ সান্ত্বনার বিষয়, াই আমার সুখ। আমার রমা ত সুখী হইবে। তবে আমিই খী না হইব ? কিন্তু হায় ! সে মনের বল কই, মানুষ যা ভাবে কই ? ভাবিয়াছিলাম সুধু রমার সুখ দেখিয়াই সুখী হইব, কিন্তু াম কই ? আমারই চোখের উপর আমার প্রাণের পুত্তলি, হৃদয়ানন্দদায়িনী, নয়নের আলো, জীবনের ধ্রুবতারা, শৈশব-ী রমা অপরের হইল,—আর তাহাকে আমার বলিবার অধিকার না। মনে মনেও যদি তাহার কথা ভাবি, তাহাতেও জগতের

চক্ষে আমি ভীষণ অপরাধী মধ্যে গণ্য হইব। এ চিন্তাও যে অসহনীয়।

কিন্তু পাষাণ আমি—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলই দেখিলাম। যখন বরবেশী সুসজ্জিত ক্ষীরোদের হস্তে, সাবগুণ্ঠনা, রক্তবসনা, সালাঙ্করা রমা তাহার নবনীনিন্দিত কোমল কুসুম করতল ন্যস্ত করিল, আমার চোখের উপর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া গেল। দুই হস্তে মাথা টিপিয়া ধরিলাম, সকলের অজ্ঞাতে চুপি চুপি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের মুক্ত বায়ু ধীরে ধীরে গায়ে লাগিতেছিল। শানায়ে বড় করুণ রাগিণী বাজিতে-ছিল। আমার বুকের পাঁজরের হাড়ের মধ্য হইতে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সাহানা রাগিণী বাজিতেছিল। ভোরের প্যাসেঞ্জার ধরিয়া কলিকাতা আসিলাম ও সে দিনের লুপমেল ধরিয়া মুঙ্গেরে আমার ভগ্নিপতির কাছে চলিয়া গেলাম। আশা-রমাকে ভুলিব। প্রকৃতির স্নেহ-কোলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিব। ভাবিয়াছিলাম রমাকে ভুলিতে না পারিলে দেশে ফিরিব না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রহিল না। প্রায় চারিবৎসর পরে বাবার পীড়ার সংবাদ পাইয়া দেশে ফিরিলাম। দেশে আসিয়া শুনিলাম, রমা এখানে নাই। স্বামীর সহিত এলাহাবাদে গিয়াছে। ভালই হয়া- আজকাল রমার দর্শন আমার ভয়ের কারণ, প্রার্থনীয় মোটেই না। মুখে

প্রায় একবৎসর পরে পিতৃদেবের কাল হইল। মৃত্যু শয্যায় শুইয়া বলিলেন, "শিরিশ! তোমায় আমি বড় ভালবাসিতাম, তোমা আমার অনেক আশা ভরসা ছিল, ভাবিয়া ছিলাম তোমা হইতে বংশ হইব। কিন্তু আমার অদৃষ্ট! তোমার দোষ কি!"

খানিক চুপ করিয়া বাবা আবার বলিলেন, "আমার এই অন্তিম :

র অনুরোধে তুমি বিবাহ কর, সংসারী হও। তোমার গর্ভধারিণীকে ার এই কষ্টের উপর বৃথা মনঃকষ্ট প্রদান করিও না।"

লজ্জায় অনুতাপে আমার চক্ষু ফাটিয়া জলধারা পড়িতেছিল। বুঝি ামার অজ্ঞাতে বাবার পায়ের উপরেও পড়িয়াছিল। একটু চমকিত-াবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কঁদিয়া বলিলাম, "বাবা, এই মাসেই আমি আপনার সেবা করিবার াসী আনিয়া দিব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" বাবার রোগা-ক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন হইল।

* * *

তারপর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কালের শীতল প্রলেপে মনের ক্ষত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি এখন একজন ঘোর সংসারী। বালা এখন আমার গৃহলক্ষ্মী, জীবনসঙ্গিনী। রমার অভাব সেই পূর্ণ রিয়াছে। রমাকে আর বড় মনে পড়ে না। সুধু অতীতের স্বপ্নের পুরাতন স্মৃতির মত তাহার সকরুণ মধুময়ী মুখখানি এত বৃদ্ধ বয়সেও কখনও নও মনের মধ্যে দেখা দেয়। চোখে আর তাহাকে কোনদিন দেখি াই। তবে সে সুখে আছে, সুখী হইয়াছে, এইটুকু জানিতে পারিয়াছি র তাতেই আমি সুখী।

সমাপ্ত